পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২১ ।। সংখ্যা ১৭ ।। ৬ নভেম্বর ১৯৮৭ ।।
১৯ কার্তিক ১৩৯৪





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



৩০ অক্টোবর '৮৭ সল্ট লেকে ইলেকট্রনিক্স লেবরেটরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সঙ্গে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কে. আর. নারায়ণন

ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ

৬ নভেম্বর ১৯৮৭

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা
ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প ও পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে

প্রধান সম্পাদক
প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলিকাতা-৭০০০০১

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

বিষয়সূচি

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২১ ।। সংখ্যা ১৭ ।। ৬ নভেম্বর ১৯৮৭ ।। ১৯ কার্তিক ১৩৯৪

সুকুমার রায় জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে

সুকুমার তথ্যচিত্র নির্মাণে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত

—মুখ্যমন্ত্রী

গত ৩১ অক্টোবর '৮৭ নন্দন প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সুকুমার রায় জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্যসরকার প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রটির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, সুকুমার রায় শতবার্ষিকীতে রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল সুকুমার রায় তথ্যচিত্র নির্মাণ। আজকের এই দিনটিকে গর্বের ও আনন্দের দিন বলেই মনে করি। উনবিংশ শতাব্দীর কথা আজ আমাদের আরও বেশি করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। সুকুমার রায় অনাবিল ছড়ায় ছন্দে শুধু শিশুদের মনই ভরিয়ে যাননি, বড়দের মনও ভরিয়ে দিয়েছেন। আজ যখন কমিকস ও নানা অপাঠ্য বই-এ বাজার ছেয়ে যাচ্ছে তখন এইসব মনীষীদের অবদানের দিকে আমাদের শিশুদের মন বেশি করে ফেরাতে হবে। অন্যান্য দেশের ভাল জিনিষ গ্রহণ করার সংগে সংগে আমাদের ভাল জিনিষ যা আছে তার প্রতিও তাদের আকর্ষণ জাগাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রসংগত বলেন, সুকুমার রায়ের রচনা আজও সকলের কাছে আনন্দদায়ক তার কারণ যা ভাল তা চিরকাল টিকে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, আমাদের সৌভাগ্য আমাদের আমন্ত্রণে সত্যজিৎবাবু কাজটি হাতে নেন ও অল্প সময়েই তা সম্পন্ন করেন। সত্যজিৎ রায়ের সৃজনশীল প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে, শ্রীরায় আরও বহুদিন নানাভাবে তাঁর অবদান রাখবেন এবং রাজ্য সরকারকে নানভাবে পরামর্শ দেবেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, সুকুমার রায় শিশু কিশোর ও পরিণত মানুষের কাছে তাঁর ছড়ায় লেখায় চিন্তায় চেতনায় নির্মল আনন্দের জগৎ তুলে ধরেছেন। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্য সরকার যে কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছেন তার মধ্যে আছে সুকুমার রচনার সহজ সংস্করণ প্রকাশ করে সুলভে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া, এ বছরের শেষভাগে কিছু নাটক মঞ্চস্থ করা এবং একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ। আনন্দের কথা রাজ্য সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে সত্যজিৎবাবু খুব অল্প সময়েই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন। তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের জন্য বহু জায়গা থেকেই দাবি আসায় রাজ্য সরকার যত বেশি সম্ভব নন্দনে প্রদর্শনের কথাও ভাবছেন।

এই প্রসংগে মন্ত্রী জানান, তথ্যচিত্রটির প্রযোজনার কাজ করেছেন রাজ্যসরকার। সত্যজিৎবাবু কাজ করেছেন রূপায়ণে যার শীর্ষে তিনি রয়েছেন এবং যে নন্দনে চিত্রটি প্রদর্শিত হচ্ছে তারও সংগে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

তথ্যচিত্রটির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীসত্যজিৎ রায় জানান, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সুকুমার রায় মারা যান। অনেকদিন থেকেই বাবার একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করার বাসনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানাবার ফলে আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

এরপর স্বল্প দৈর্ঘের সুকুমার তথ্যচিত্রটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়।



গত ৩১ অক্টোবর '৮৭ নন্দন প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সত্যজিৎ রায়।

পুলিস বাহিনীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী

ভাষা ও ধর্মমত নির্বিশেষে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষাই পুলিসের অন্যতম কর্তব্য —মুখ্যমন্ত্রী

গত ২৮ অক্টোবর গোবিন্দ খটিক লেনে নবনির্মিত ট্যাংরা থানাভবনের উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, মনে রাখবেন পুলিসের পোশাক যিনি পরেছেন তিনি কোন ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়ে বা দলের লোক নন। ভাষা, ধর্মমত নির্বিশেষে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষাই পুলিসের অন্যতম কর্তব্য। তিনি আরও বলেন,

বিভিন্ন রাজ্য থেকে খবর আসে, পোশাক পরিহিত পুলিস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ নিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। এটা গর্বের কথা যে, এ রাজ্যে এমন ঘটনা কল্পনা করা যায় না। তবু পুলিসকে সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন সম্মেলন, আলোচনাসভায় মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের মানসিকতাকে উন্নত করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া ও সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা ও স্বস্তি দেওয়াই পুলিসের অন্যতম কর্তব্য।

নবনির্মিত এই থানা-ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতীয় পুলিস-বাহিনীর কাজ, দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার আগে পুলিসের কাজ ছিলো যে-কোনো প্রকারে ব্রিটিশ রাজত্বকে টিকিয়ে রাখা। আর স্বাধীন দেশের পুলিস-বাহিনীকে কাজ করতে হয় দেশের উন্নয়নকে অব্যাহত রেখে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা ও শিক্ষার অভাবে পুরনো কিছু অভ্যাস এখনও পুলিসের মধ্যে থেকে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য সেসব ঔপনিবেশিক অভ্যাসের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-বাহিনীকে যে পরিমাণ গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তা ভারতে বিরল। এ-রাজ্যের পুলিস-বাহিনী সংগঠন গড়ার ও সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি-দাওয়া, অভাব অভিযোগ জানানোর সুযোগ পেয়েছেন। প্রায় প্রতি মাসে এসব সংগঠনকর্মীরা আলোচনায় বসেন ও প্রয়োজনীয় দাবি পেশ করেন উচ্চতর প্রশাসনের কাছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করার দায়িত্বও নিতে হবে পুলিস কর্মী সংগঠনগুলিকে। মুখ্যমন্ত্রী পুলিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বলেন, নিচের তলার পুলিস-কর্মীদের প্রতি সমবেদনা নিয়ে তাঁদের অভাব, অভিযোগের কথা আপনাদের শুনতে হবে। উঁচু ও নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হলে সঠিক ও সুষ্ঠু কাজ ব্যাহত হবে।

সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করতে সমস্ত পুলিসবাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা জন্য আপনারা নিযুক্ত, তাঁরা যেন আপনাদের শত্রু না ভাবেন। কেবল বড়ো বড়ো তদন্তের সমাধান নয়, অনেক ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেও আপনাদের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে হবে। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে



২৮ অক্টোবর ট্যাংরা থানা ভবনের উদ্বোধন করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

হবে। নিরক্ষর কোন মানুষ থানায় এলে ব্যবহার অবশ্যই ভালো করতে হবে। বসার জন্য একটা টুল অন্তত এগিয়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষের দীর্ঘ অভিযোগে অধৈর্য হলে চলবে না। সমস্তটা শুনে তদন্ত চালাতে হবে। বসু বলেন, বন্যার সময় দেখেছি অনেক অঞ্চলের পুলিসই চাঁদা তুলে বন্যাক্রান্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। মানুষকে ছোট ছোট কাজে সাহায্য করা, ভালো ব্যবহারটুকু করা, সময়ে অসময়ে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এভাবে বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে পলিসকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে হবে। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বন্ধ করতে পুলিস-বাহিনীকে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আমরা আসার পরই বলে দিয়েছি, নিয়মাফিক আন্দোলনে পুলিস কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বৈষম্য, অত্যাচার যখন আছে, আন্দোলনও তখন চলবে।

সম্প্রতি কলকাতার কয়েকটি থানা লক-আপে পুলিসী হেফাজতে বন্দীর মৃত্যুর ঘটনাকে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনো সভ্য দেশে এসব চলতে পারে না। এখানে এসব ঘটনা খুবই কম। কিন্তু তা-ও হওয়া উচিত নয়। এই ধরনের যে তিনটি ঘটনার কথা সম্প্রতি আমাদের কানে এসেছে, তার প্রতিটির তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এসব তদন্তের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে, দ্রুত রিপোর্ট দিতে হবে। এই কয়েকটি ঘটনায় সমস্ত পুলিস-বাহিনীর বদনাম হয়েছে। তাই এসব কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, পুলিসকেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। তাঁদের কাজের ধরনই এরকম। তাই পুলিস পরিবারবর্গকে দেখাশোনা করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

পুলিসের আবাসন সমস্যা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা সারাদিন মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতায় এতো বড়ো কাজ করা খুবই কঠিন। বামফ্রন্টের আগে এসব নিয়ে কেউ পরিকল্পনাও করে নি। যাইহোক, কয়েক বছর আগে পুলিস আবাসন খাতে কেন্দ্র কিছু টাকা দিয়েছে। যে সময়ের হিসেবে কেন্দ্র এই টাকা দিয়েছে সে সময় আর নেই। জিনিসের দাম বেড়েছে প্রচুর। তা সত্ত্বেও ঐ টাকায় যতটা সম্ভব পুলিস ব্যারাক ইত্যাদি করা হচ্ছে। এনিয়ে একটা বিশেষ সেলও গঠন করা হয়েছে। এছাড়া একটা অঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা বিচার করে এখন পুলিস থানা করা হচ্ছে। আগে এসব পরিকল্পনাই নেওয়া হতো না। এখন হচ্ছে। ফলে ট্যাংরার মতো অনেক নতুন থানা গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। জমি ও অর্থের সমস্যা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কি করা যাবে। সীমিত ক্ষমতাতেই রাজ্য সরকার যা করার করে যাবে।

এদিনের সভায় স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সুমন্ত হীরা বলেন, বামফ্রন্টের ১০ বছরের শাসনে ট্যাংরা অঞ্চলের আইন-শৃংখলা যে কতোটা উন্নত হয়েছে তা এখানকার সাধারণ মানুষ জানেন। এক সময়ের অপরাধের কেন্দ্রস্থল ট্যাংরায় আজ গভীর রাতেও সাধারণ মানুষ একাকী বাড়ি ফিরতে পারেন। তিনি বলেন, সমাজ-ব্যবস্থার দোষেই প্রতিদিন অপরাধের ঘটনা বাড়ছে। সুষ্ঠু প্রশাসনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার মধ্যেই বামফ্রন্ট আইন-শৃংখলা ব্যবস্থার উন্নতিতে সাফল্য পাচ্ছে। নবনির্মিত থানা-ভবন ও ট্যাংরা অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা পুলিসের কমিশনার শ্রী বিকাশকলি বসু। এদিনের সভায় অঞ্চলের বহু সংগঠন, ক্লাব ও ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বন্যাত্রাণের অর্থ তুলে দেন। নবনির্মিত এই ট্যাংরা থানাটি হল কলকাতা পুলিসের অন্তর্গত ৩৫তম থানা। ট্যাংরার পৌনে তিন বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার্থে এই নতুন থানা-ভবনটি পাওয়া গেছে কলকাতার পৌরসভার কাছ থেকে। এন্টালি থানার সমসংখ্যক পুলিস কর্মী কাজ করবেন ট্যাংরা থানায়।

আধুনিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত —মুখ্যমন্ত্রী

গত ৩0 অক্টোবর বিধাননগরের ১00 একর জমির ওপরে নির্মীয়মান ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের আধুনিক গবেষণাগার ইলেকট্রনিক্স রিজিওন্যাল টেস্টিং ল্যাব (ইস্ট)-র প্রস্তাবিত ভবনের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক ইলেকট্রনিক্স-এর প্রসারে এই কমপ্লেক্স ও ল্যাবেরেটরি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

বসু বলেন, আধুনিক ইলেকট্রনিক্স শিল্পের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে জড়িত করতে এই ধরনের কমপ্লেক্স আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই দাবি জানিয়ে আসছে কেন্দ্রকে। অবিলম্বে আমাদের রাজ্যে ইলেকট্রনিক্স শিল্পপ্রসার যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সেটা উপলব্ধি করেই আমরা এজন্য আলাদা করে ১00 একর জমিও রেখে দিই এই বিধাননগরে। এ নিয়ে কত মহলে কত যে আলোচনা ও চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছে তা হিসাব করা যাবে না। আমরা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ইলেকট্রনিক্স শিল্প-স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে যাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এককথায় পশ্চিমবঙ্গের এতো জরুরী দাবিটিকে নাকচ করে দিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তি দেখাল, বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি। তাই প্রতিরক্ষা দপ্তর এই প্রকল্প অনুমোদন করবে না। এই অদ্ভুত যুক্তিতে হতবাক হয়ে আমি শ্রীমতী গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি নিজে এই যুক্তিতে বিশ্বাস করেন? তিনি মৃদু হেসেছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে সীমান্তের কথা হঠাৎ ভুলে গিয়ে হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে বিশাল বিশাল ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স গড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাইহোক কিছু করার ছিল না। বামফ্রন্টের জন্মলগ্ন থেকেই দেখে আসছি, কেন্দ্র এ রাজ্যের প্রতি অবিচার করছে। কিন্তু এ জাতীয় প্রকল্পেকে খেলে রাখা যায় না। কারণ আমরা নিশ্চিত যে ইলেকট্রনিক্স শিল্প পশ্চিমবঙ্গকে অনেক অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। কর্মসংস্থান করে দেবে বহু মানুষের। অথচ রাজ্য সরকারের হাতে এতো বড়ো প্রকল্প রূপায়ণ করার মতো টাকা নেই। কেন্দ্রও দেবে না। তাই সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও যৌথ ও ব্যক্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আমরা এই বিশাল ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছি। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে কেন্দ্রে অনীহা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এই প্রকল্প খুব শীঘ্রই রূপায়িত হবে।

দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে শ্রীজ্যোতি বসু

বলেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার দোষে আমাদের দেশ আধুনিক প্রযুক্তি থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু আর আমরা পিছনে পড়ে থাকতে চাই না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বিদেশী প্রযুক্তির প্রতি ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে দ্রুত কমিয়ে আনা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের ইলেকট্রনিক্স শিল্পে জোয়ার আনতে বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স রাজ্য সরকারের প্রারম্ভিব পদক্ষেপ। এই প্রকল্প রূপায়িত হবার পরই দ্রুত এই শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।

বর্তমান বিশ্ব ইলেকট্রনিক্স শিল্পের বিভিন্ন সুবিধাগুলি দিক ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শিল্পের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হল অত্যন্ত অল্প বিনিয়োগে প্রচুর কর্মসংস্থান হয়। বিশেষ করে মহিলারা এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশ নিতে সক্ষম হন। তবে একাজে ক্রমাগত পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান করে নিতে উৎপাদন সামগ্রীর উন্নত গুণমান পরীক্ষাও একান্ত জরুরী। এই টেস্টিং ল্যাবরেটরি ভবিষ্যতে কমপ্লেক্সের এসব প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিশেষ সাহায্য করবে। তিনি বলেন, এই টেস্টিং ল্যাবরেটরি বানাতে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিছু সাহায্য করবে। তিনি বলেন, এই টেস্টিং ল্যাবরেটরি বানাতে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু এ রাজ্যে ইলেকট্রনিক্স শিল্প বিকাশের প্রাথমিক ও মূলগত দাবিগুলি কেন্দ্র নাকচ করায় রাজ্য সরকারকে অনেক অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে একাজ করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলে ইলেট্রনিক শিল্প বিকাশে কেন্দ্রীয় সহায়তা দাবি করে শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, আশা রাখি, ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে আরও কাছাকাছি আসতে পারবে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগে এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে আর নারায়ণন বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে উন্নত বিজ্ঞান চিন্তা সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভারতের পথপ্রদর্শক। এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষ দ্রুত ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে উন্নত করে তুলতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেরালা রাজ্য কে অন্যান্য উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেন।

এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইলেকট্রনিকস দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল এম মুকুটমণি, সচিব কে পি পি নাম্বিয়ার এবং ইলেকট্রনিক রিজিওন্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরির যুগ্ম ডিরেক্টর এ দেওভক্ত।

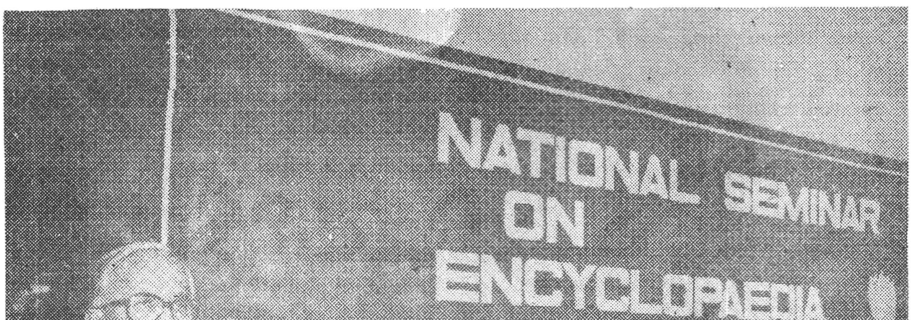
বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার গুরুত্ব অপরিসীম

—মুখ্যমন্ত্রী

গত ৩০ অক্টোবর বাঙলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষ বা বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া) রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে অর্গানাইজিং কমিটি, ন্যাশনাল সেমিনার অন এনসাইক্লোপিডিয়ার মৌলালি যুবকেন্দ্রে যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করে সেই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত মর্মে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করে বলেন, আপনাদের এই শুভ উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। বাঙলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি আরও বলেন,

এ কাজ করার মত যোগ্য ব্যক্তি আমাদের রাজ্যে অনেকেই আছেন। তবে কাজটা একদিনের নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটা নিরলস প্রচেষ্টা। মনে রাখতে হবে অন্যের অনুকরণ নয়, নিজেদের দেশের অবস্থার মত করেই এটি রচনা করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বকোষ রচনার মত কাজে পরিকাঠামোগত সাহায্য প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথাসাধ্য সমস্ত রকম সাহায্য করবে। তিনি উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ঠিক কী কী ধরনের সাহায্য আমরা করতে পারি সে সম্পর্কে আপনারা নির্দিষ্ট করে বলুন। তবে আপনাদের তরফে পান্ডিত্যে কোন ঘাটতি না থাকলেও, আমাদের অর্থাৎ রাজ্য সরকারের টাকা পয়সা খুবই সীমিত। তবু আমরা একাজকে অগ্রাধিকার দেব। তিনি বলেন, আমরা মনে করি না যে সরকারি হুকুম জারি করে চিন্তার জগতে কোন উৎকর্ষ সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের কাজে যাঁরা যুক্ত থাকবেন, তাঁদের স্বাধীনতা দিতে হবে। শ্রী বসু বলেন, অন্যান্য যে সব রাজ্যে বিশ্বকোষ তৈরি হয়েছে সে সব রাজ্যের সঙ্গেও আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বাঙলা দেশের থেকেও সে দেশের অভিজ্ঞতা নেওয়ার। কারণ সেখানে বাঙলা ভাষায় অনেক ভাল কাজ হয়েছে।

বিশ্বকোষ রচনা নিয়ে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা চক্রের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্যে বহু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনায় আগ্রহী। বিষয়ের একাত্মতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিক চেতনার উৎস তৈরি করতে বিশ্বকোষের প্রয়োজন। যারা এই বিশ্বকোষ রচনা করবেন রচনায় তাঁদের সম্পূর্ণ



৩০ অক্টোবর মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিশ্বকোষ সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

স্বাধীনতা থাকবে। কোনোরকম মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে না। চলতি আর্থিক বছরে বাজেটে ধরা না থাকলেও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে যে বাজেট আছে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তা থেকে আর্থিক সাহায্য করা হবে যদি এ বছর কাজ শুরু করা হয়। সামনের বছর থেকে এ ব্যাপারে বাজেটে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

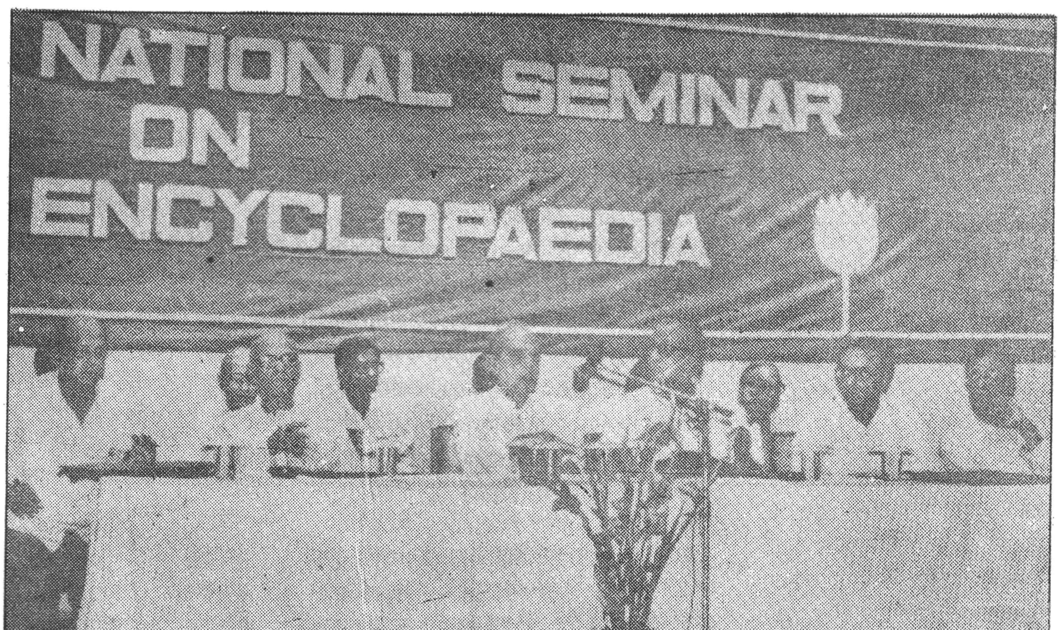
রাজ্যের যুব ও ক্রীড়া বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী বলেন, শুধুমাত্র দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করলেই হবে না, সাথে সাথে বিশ্বকোষ রচনার মতো উন্নত মানের প্রচেষ্টার কথাও চিন্তা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। তাই সকলের মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীয়মান করা দরকার ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এটা উন্নত ধরনের। এই বিশ্বকোষ তৈরির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। নানারকম বিতর্ক থাকতে পারে। তাই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পন্ডিত ও বিদগ্ধ-বর্গের মূল্যবান উপদেশ ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এ বিশ্বে জ্ঞানই হয়ে দাঁড়াবে সব থেকে বড় শক্তি। আমরা যদি জ্ঞানের সঞ্চয় না করি এবং দ্রুত জ্ঞান বৃদ্ধির হার বাড়াতে না পারি তবে ইতিহাসে আমাদের কোন স্থান থাকবে না। তাই দেরিতে হলেও বাঙলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা জরুরী। সৌভাগ্যবশত এই বাঙলায় আমাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশ্বকোষ রচনার জমি উর্বরা করে দিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, বিশ্বকোষ রচনাকে একটি উন্নয়নশীল দেশের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংগ হিসাবেই গণ্য করতে হবে। বিশ্বকোষ শুধু সাধারণ জ্ঞানের বই নয়, বিশ্বকোষ হলো প্রেরণাদাতা, শিক্ষক এবং একটা আন্দোলনও। তিনি বলেন, এদেশে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরাই জনসাধারণের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দিয়ে থাকেন। যদি তাঁদের কাছে বিশ্বকোষ পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে আধুনিক লাইব্রেরি অথবা বিশেষজ্ঞ না থাকলেও তাঁদের উৎসাহ অথবা কৌতূহল অবদমিত হবে না। অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেও বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে সেগুলির প্রত্যেকটিতেই নানারকম ঘাটতি আছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঘাটতি, সাংগঠনিক ঘাটতি, দূরদৃষ্টির ঘাটতি ও সর্বোপরি সুযোগ্য সম্পাদনার ঘাটতি লক্ষণীয়। আরো যা নেই তা হলো আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। দার্শনিক দিদেরোঁকে উদ্ধৃত করে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বকোষকে হতে হবে বিশ্বের দর্পণ। তেমনি জাতীয় বিশ্বকোষকে হতে হবে জাতীয় দর্পণ। এ কাজ করা সহজ নয়। সাবধানতা ও নিরলস পরিশ্রম দরকার।

অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় বলেন, আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞের অভাব নেই, অথচ বিশ্বকোষ রচনা যে আজও আমাদের কাছে একটা কষ্টকল্পিত ব্যাপার এটাই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্বকোষের আন্দোলনে আজ আমরা অন্যান্য দেশের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। তবে আমার আশা সমাজের পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষপ্রতিষ্ঠান সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বিশ্বকোষ রচনার কাজে আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষে ডঃ রাধারমণ চক্রবর্তী এবং ডঃ অধৃষ্য কুমার।

'জ্ঞানকোষ ও সমাজ বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

তিনদিনের এই আলোচনায় বহু গণ্যমান্য বিদগ্ধ পন্ডিতরা বক্তব্য পেশ করেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পন্ডিত শ্রীগৌরী শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বিশেষজ্ঞ ও গুণীজনের পরামর্শের ভিত্তিতে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনাকে সত্যিকারের অর্থে রূপ দিতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।



এনসাইক্লোপেডিয়া নিয়ে জাতীয় আলোচনাচক্রের সমাপ্তি অধিবেশনে সুভাষ চক্রবর্তী, নিশীথরঞ্জন রায়, গৌরী শাস্ত্রী, সুশীল মুখার্জি, অসীম দাশগুপ্ত এবং অশীন দাশগুপ্ত।

অরণ্য ও অরণ্য প্রাণী রক্ষা করুন

ডঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়

সেদিন চলে গেছে যেদিন সমগ্র মানবজাতি পাখির গান শুনে জেগে উঠত, যখন বাসস্থানের অদূরেই আঁধার রাতে শৃগাল প্রহর ঘোষণা করত, বাঘের ডাক শুনতে শুনতে শিশু মায়ের বক্ষলগ্ন হয়ে ঘুমোত, যখন কাকের দল পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট সাফ করে দিত, যখন শকুন শব সরিয়ে নিত, যখন কাকের উড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের সরল রেখা সম্বন্ধে ধারণা পেতাম, যখন দিকহারা জাহাজকে শঙ্খচিল তীরের নির্দেশ দিত, যখন বন্যপ্রাণীদের কাছ থেকে আমরা পেতাম ঝড়জল এমন কি ভূমিকম্পের সঙ্কেত যখন প্রাণীকুলের মধ্যে আমরা খুঁজতাম বর্ণ বৈচিত্র্য, কখনো পাখিকুল ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াত, এরপর সবুজ পাতা পরিবৃত গাছের নীড়ে বিশ্রাম নিত কিম্বা সবুজ ঘাসের উপর তারা নেমে আসত। আমরা নিজস্ব গৃহ রচনা করতে শিখলাম, খাদ্যের সন্ধানে অরণ্যে প্রান্তরে ছুটে গেলাম, ভালবাসতে ও ঝগড়া করতে শিখলাম এবং আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা পেলাম, যখন তরুণ তরুণী তাদের কালো চুল আলো পালিকে সাজাত অন্যরা তাদের নানারঙা ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে মানানসই করে তুলত। এই হলো আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য যা আমাদের পূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু এই কি সব?

মানব সমাজ তার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য, অর্ধেক ওষুধ পত্র, পোশাক পরিচ্ছেদের অনেকখানি, জ্বালানির প্রায় সবখানি, গৃহ নির্মাণের মাল মশলা, কৃষি যন্ত্র প্রভৃতি প্রজনন সম্পদের কাছ থেকে পেয়েছে।

প্রকৃতি তার পরিবেশ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিয়ে তার পরিবেশ ব্যবস্থাদি দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে এবং প্রাণ বৃত্তকে সম্পূর্ণ করেছে।

গভীর অরণ্য তার পত্ররাজি, পুষ্প ও ফল নিয়ে প্রকৃতির খামখেয়ালকে অগ্রাহ্য করেও বেঁচে থেকেছে, বেঁচে থেকেছে বিভিন্ন ঋতুর বৈচিত্র্যের মধ্যে, উত্তাপে ও বৃষ্টিতে সমগ্র বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আলোক সংশ্লেষ প্রাণকে দূষণমুক্ত রেখেছে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবণধারণের অনুকূল করেছে। এতে জীবন বৃদ্ধিলাভ করেছে ও জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ শত কোটির অধিক।

কিন্তু সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। আমরা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ওভার ড্রাফট্ নিলাম এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে, চরম বিপর্যয়ের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

কিন্তু এর বিয়োগান্ত দিকটা হলো এই যে আমরা যদি অবক্ষয়িত জমিকে আবার উর্বর করে তুলতে পারি,বিনষ্টপ্রায় অরণ্যকে আবার সবুজ করে তুলতে পারি, তাহলেও কিন্তু যেসব প্রজাতি, উদ্ভিদ বা প্রাণী আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলি আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না, কিংবা বিবর্তনের পথে ২০০ কোটি বা ততোধিক বছরের পূর্ণ বৃত্তটি যদি আবার পুরোপুরি ঘুরে আসে তবেই বা কি হবে, তাও কেউ জানে না।

আর এর সবকিছুরই মূলে আছে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক এবং ঔপনিবেশিক বা নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে, প্রাগ্রসর ও অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে বৈষম্য।

অথবা, ওয়ালর্ড কমিশন অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সভাপতি মিসেব গ্রো হারলেম ব্রান্ডল্যান্ড যে বলেছেন যে 'আজ পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে', সেটাই বা না মেনে আমাদের উপায় কী?

বিশ্ব ব্যাংক বলছেন, এই ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

দারিদ্র্য ও অসাম্যের কারণে জীবনের মান ক্ষুণ্ণ হয় এবং আগামী দিনে জীবনের মান উন্নত করার লক্ষ্যে সমাজের ক্ষমতা দারুণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এ ব্যাপারটা কি করে ব্যাখা করা যায় যে আগামী ২000 খৃস্টাব্দ নাগাদ চাষযোগ্য জমি ও নিরক্ষীয় অরণ্যের পরিমাণ ঠিক অর্ধেক কমে যাবে, যদিও জনসংখ্যা ঐ সময়ের ৭00 কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। এবং ২0২0 খৃস্টাব্দ নাগাদ বাকি অরণ্যভূমি ও উর্বর জমিরও অর্ধাংশ হারাব, কারণ জনসংখ্যা ততদিনে দেড়গুণ বেড়ে যাবে। আর এ সবই হবে স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য, যদি লাভ তাকে আদৌ বলা যায়।

প্রেক্ষাপট বাস্তবিকই ভয়াবহ এবং এসব অবাধে চলতে থাকে পৃথিবীতে তবে জীবনের অস্তিত্বই এর জন্য বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা হল এই যে প্রকৃতির উপর হামলাবাজি কমে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আপাত বিরোধী ব্যাপার হল এই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যখন এগিয়ে চলেছে এবং আমরা যখন সত্যিসত্যিই প্রজনন এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিত্তিতে প্রজনন বিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছি, সে সময়ে আদিম মানসিকতার বশবর্তী হয়ে প্রজনন-সম্পদ নির্বিচারে বিনষ্ট করা হচ্ছে।

দরিদ্রতম মানুষেরা নিছক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণটুকু জোটানোর জন্যে অরণ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল, আর চরম ধনী ব্যক্তিরা প্রকৃতিকে লুন্ঠন করে পরিবেশ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছে শুধু তাদের ভোগবহুল জীবন যাত্রার মানকে অটুট রাখার জন্য, গোটা শ্রমিক বাহিনীকে পায়ের তলায় রাখার জন্য।

এমনকি তাদের বিলাস-ব্যসনের জন্যও অরণ্যকে চরম মূল্য দিতে হয়। আমরা ৪ লক্ষ সাপের চামড়া ইদানীং বাজেয়াপ্ত করেছি, এগুলি জাহাজে বিদেশে পাচারের অপেক্ষায় ছিল। পোশাকের ব্যবহারের জন্য মহিলাদের প্রসাধন পেটিকার অলংকরণের জন্য কুমীরের চামড়া রপ্তানী করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ৪৭ মেট্রিক টন ব্যাঙের ঠ্যাং-এর রপ্তানীর ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। সম্প্রতি আমরা ৬000 পাখী আটক করায় তথাকথিত দুঃস্থ ব্যবসায়ীরা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন, আর আমরা ও রায়ের অপেক্ষায় আছি

আমরা এই বিরুদ্ধ স্রোতের কাছে, ব্যবসাদার ও তাদের দালালদের ষড়যন্ত্র ও চাতুরীর কাছে, আত্মসমর্পণ করতে পারি না। আমরা পারিনা প্রকৃতির মহান উত্তরাধিকার, তার সম্পদের ভান্ডারকে এই অর্থ গৃধ্নুদের হাতে তুলে দিতে। এ সমস্তকে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে।

তবে আশার আলোর চকিত আভাস মিলেছে, জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠছেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং গণসংগঠনগুলি আমাদের অরণ্য সম্পদ রক্ষায় বজ্রকঠিন জন প্রতিরোধ গড়ে তোলার, আর হৃত সম্পদকে ফিরে পাওয়ার, গড়ে তোলার জন্য হাজার হাজার নর-নারীর সাথে শ্রমদানের শপথ নিয়েছেন। পশিচমবঙ্গে বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার পথের দুই ধারকে তরু শোভিত করতে, পতিত অনাবাদী জমিতে আবাদ শুরু করতে, বাঁধগুলিকে বৃক্ষাচ্ছাদিত করতে ও সেইসঙ্গে ঘরোয়া

❐ (শেষাংশ ৩৬৮ পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীর আলোচনা সম্পর্কে রিপোর্ট

২৬ অক্টোবর বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সত্যরঞ্জন বাপুলী প্রস্তাব করেন, গত ২৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী এইচ কে এল ভগতের সঙ্গে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী নির্মল বসুর যে আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী বিধানসভায় একটি বিবৃতি দিন। এই অনুযায়ী আমি নিম্নলিখিত বিবৃতি বিধানসভায় পেশ করছি।

গত ২৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ আমি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও অসামরিক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তর, রেলওয়ে বোর্ড, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন এবং ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রদত্ত লিখিত নোটে বলি, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে রেপসিড তেল বরাদ্দ করছেন, সেই অনুযায়ী তেল আমরা পাচ্ছি না এবং তার ফলে রাজ্যে ভোজ্য তেলের ব্যাপারে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে আমি দেখাই, আগস্ট, ১৯৮৭ মাসে যেখানে রেপসিড তেলের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল ১৫.৫ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে আমরা পেয়েছি ১২,২৩৮ মেট্রিক টন। সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭-তে বরাদ্দ ছিল ১৮ হাজার মেট্রিক টন, কিন্তু পাওয়া গেছে ১৫,৮৮২ মেট্রিক টন। আর, অক্টোবর, ১৯৮৭-তে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল ২০.৫ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু ২২ অক্টোবর, ১৯৮৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ মাসের তিন-চতুর্থাংশ পার হয়ে যাবার পরেও পাওয়া গেছে মাত্র ৫ হাজার মেট্রিক টন। বরাদ্দ সত্ত্বেও এত কম তেল পাবার কারণ বোম্বাই-তে কেন্দ্রীয় সরকারের শোধনাগারের গোলমাল, অমৃতশহর ও কানপুরের শোধনাগারের ঠিকমত কাজ না করা, তেলবাহী রেল রেক চলাচলে অব্যবস্থা এবং কলকাতা বন্দরে জাহাজ মারফত অপরিশোধিত রেপসিড তেল সরবরাহে বিলম্ব। এছাড়া, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা হিন্দুস্থান ভেজিটেবল্ অয়েল করপোরেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য দেবার কথা, দুই কেজি প্যাকে প্রতি মাসে ১৫০০ মেট্রিক টন রেপসিড তেল কিন্তু কোনমাসেই তারা বরাদ্দমত এই তেল দিতে পারেনি। আগস্ট, ১৯৮৭-তে তারা দিয়েছে ৫৬৬ মেট্রিক টন, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭-তে ৩৭৩ মেট্রিক টন, আর অক্টোবর ১৯৮৭-তে ২২ তারিখ পর্যন্ত ৩৮৮ মেট্রিক টন।

আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রেপসিড তেলের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করায় এবং পরবর্তী মাসগুলিতে এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে, এই প্রতিশ্রুতি পাবার পরেই রাজ্য সরকার সরষের তেলের দাম বেঁধে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বরাদ্দের থেকে অনেক কম তেল পাবার ফলে গণবন্টন ব্যবস্থায় রেশন দোকান মারফত সর্বত্র রেপসিড তেল সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি, এবং এই সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারলে অসাধু তেল ব্যবসায়ীদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা যেত, তাও করা যায়নি।

আমি তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করি, বরাদ্দমত রেপসিড তেল যাতে আমরা পাই, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং রেল কর্তৃপক্ষ সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এ ব্যাপারে তৎপর হতে বলুন।

উত্তর প্রদেশ সরকার নির্দেশ জারি করেছেন, উক্ত রাজ্যের বাইরে সরষের তেল যেতে দেওয়া হবে না। এর ফলে এই রাজ্যে সরষের তেল আনতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করুন। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আবার আমি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করি।

কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন, বিদেশ থেকে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন তৈলবীজ আমদানী করা হবে। সংবাদ পাওয়া গেছে এই আমদানীর প্রথম কিস্তি হিসাবে ৭০ হাজার মেট্রিক টন তৈলবীজ ইতিমধ্যেই জাহাজে করে সমুদ্রপথে ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করি, এই তৈলবীজের একাংশ কলকাতা বন্দরে খালাস করার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে করে এই রাজ্যের তেল কলগুলিতে তা ভাঙিয়ে, এখানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে নির্দেশ দেন, পশ্চিমবঙ্গ যাতে কেন্দ্রের বরাদ্দমত রেপসিড তেল পায় সেদিকে নজর রাখতে। বৈঠকে অক্টোবর মাসের বাকি দিনগুলি এবং নভেম্বর মাসে কিভাবে এই তেল পাঠানো হবে, তার কর্মসূচি প্রস্তুত হয়। স্থির হয়, ২৪ থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আরও অন্তত ৭।৮ হাজার মেট্রিক টন তেল এখানে পৌছে দেওয়া হবে। এই তেল পৌছলেও অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের হিসাবে ৭ হাজার মেট্রিক টনের ওপর ঘাটতি থেকে যাবে। আর আগস্ট সেপ্টেম্বরের বকেয়া ঘাটতি যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১২ হাজার মেট্রিক টনের ওপর। সাত দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এই রাজ্যে ৭ হাজার মেট্রিক টন রেপসিড তেল পৌছাতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমি সংশয় প্রকাশ করি। তবু সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে, এই স্থির হয়।

২ কেজি প্যাকে প্রস্তুত রেপসিড তেলের সরবরাহ বাড়িয়ে অক্টোবরের মধ্যে যাতে ৮০০ মেট্রিক টন, এবং নভেম্বরে ১২০০ মেট্রিক টন করা সম্ভব হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্দেশ দেন।

এই রাজ্যের জন্য রেপসিড তেলের ব্যাপারে যে বিপুল পরিমাণ বকেয়া জমে যাচ্ছে তা কিছুটা পূরণের জন্য স্থির হয়, বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত রেপসিড তেলের বাইরে এই রাজ্যের জন্য অক্টোবর মাসে এক হাজার মেট্রিক টন এবং নভেম্বর মাসে আরও দেড় হাজার মেট্রিক টন পাম অয়েল দেওয়া হবে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্যের বাইরে সরষের তেল পাঠানো বন্ধ করে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর করে কি করা যায় দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

আমদানীকারীরা তৈলবীজ এসে পৌছলে তার একাংশ যাতে কলকাতা বন্দরে খালাস করে এখানকার তেলকলগুলিতে দেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের অফিসারদের নির্দেশ দেন।

ভোজ্য তেল ছাড়াও এই রাজ্যের জন্য সরবরাহ করা গমের ব্যাপারে যে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সে বিষয়েও আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি এফ সি আইকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য নির্দেশ দেন।

২৭ অক্টোবর, ১৯৮৭

স্বাক্ষর
নির্মল বসু

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

শিলিগুড়িতে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

১ নভেম্বর, ১৯৮৭ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু শিলিগুড়িতে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন এবং পার্বত্য উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীতামাং দাওয়া লামা প্রধান অতিথি রূপে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১ নভেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ঐ তথ্যকেন্দ্রে ৮৭৬ আসন বিশিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ, একটি পঠন-পাঠনের ঘর তথা গ্রন্থাগার ও প্রদর্শনী কক্ষ থাকবে।

হজ তীর্থ যাত্রীদের অব্যবহৃত যাতায়াত খরচের টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে

১৯৮৭ সালে জাহাজে হজ যাত্রার জন্য দেওয়া যে টাকা অব্যবহৃত থেকে গেছে শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, বম্বে কর্তৃক স্টেট হজ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ-এর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত তীর্থযাত্রী তাদের যাতায়াত খরচের টাকা কাজে লাগাননি বা যারা অপেক্ষমাণের তালিকায় ছিলেন কিন্তু মেসার্স শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া, লিমিটেড, বম্বে যাদের স্থান সংকুলান করতে পারেনি, তাদের রাজ্য হজ কমিটি পশ্চিমবঙ্গ-এর মহাকরণস্থ দপ্তরে যে কোন কাজের দিন একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে ঐ অব্যবহৃত টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সহ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রীকে স্বয়ং উপস্থিত থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে না।

জগদ্ধাত্রী পূজায় মাইক ও লাউড স্পীকারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

কলকাতার পুলিস কমিশনার এক নির্দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন যে পূজামণ্ডপ থেকে লাউড স্পীকার ও মাইকের মাধ্যমে গান বাজানো নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে নিম্নলিখিত দিনগুলিতে নির্ধারিত সময়ে পূজামণ্ডপের ভিতরে মাইক বাজানো যেতে পারে।

৩১ অক্টোবর, ১৯৮৭, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা; সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা।

১ নভেম্বর, ১৯৮৭, বিসর্জনের দিন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা।

প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া উপরিউক্ত নির্দেশ না মেনে অথবা অনুমতি প্রদানের সময় কর্তৃপক্ষ আরোপিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করে মাইক অথবা লাউড স্পীকার বাজানো দণ্ডনীয়।

রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য তদর্থক পারিবারিক পেন্সন

যে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় ১৯৬৫ সালের ১ এপ্রিলের পূর্বে কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ জানুয়ারির পরে মারা গেছেন, তাদের বিধবা পত্নীরা ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর থেকে মাসিক ১৫০ টাকা হিসাবে থোক তদর্থ পারিবারিক পেন্সন পাবেন, সংশ্লিষ্ট মৃত কর্মচারীর বেতন যাই হোক না কেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিধবা পত্নীদের আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছিলেন, সরকারের বর্তমান নির্দেশ বলে ঐ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি রূপায়িত হতে চলেছে।

যেসব বিধবা অন্যকোনো সরকারি ভাতা ভোগ করেন না কেবল মাত্র তারাই উপরি উল্লিখিত তদর্থক পারিবারিক পেন্সন পেতে পারেন। বর্তমানে ত্রাণ ও কল্যাণ দপ্তরের প্রকল্পের আওতায় বিধবা বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন এমন কোনো মহিলা যদি তদর্থক পারিবারিক অবসর ভাতার জন্য অন্যথায় উপযুক্ত হন এবং আবেদন করেন, তবে বর্তমান বিধবা বার্ধক্য ভাতার পরিবর্তে তাকে ঐ ভাতা প্রদান করা হবে। যেসব বিধবা অর্থ বিভাগের স্মারক নং ৩২৫৮ এফ তাং ২৮. ৩. ৮০ এবং তৎসহ স্মারক নং ৫৯৮২ এফ তাং ৫. ৮. ৮১ বলে এক্স গ্রাশিয়া পারিবারিক পেন্সন ভোগ করেছেন তাঁদেরও অ্যাড-হক পারিবারিক পেন্সন দেওয়া হবে। তা দেওয়া হবে এক্স গ্রাশিয়া পারিবারিক পেনশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন বা ১. ১০. ৮৭ যে তারিখটিই পড়ে পড়ুক না কেন সেই দিন থেকে। এখন থেকে কোন এক্স গ্রাশিয়া পারিবারিক পেন্সন মঞ্জুর করা হবে



শিলিগুড়িতে তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

না। সংশ্লিষ্ট বিধবার (দের) মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই অ্যাড-হক পারিবারিক পেন্সন দেওয়া হবে। যেসব বিধবা ১. ১০. ৮৭ তারিখে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তারপর মারা গেছেন, অথচ মরার আগে অ্যাড-হক পারিবারিক পেন্সশনের জন্য আবেদন করে যেতে পারেন নি, সেসব ক্ষেত্রে অ্যাড-হক পারিবারিক পেন্সন দেওয়া হবে না। যেসব বিধবাকে আজীবন এক্সগ্রাশিয়া পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন করে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

বিধবাদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ধারিত ফর্মে দু কপি করে দরখাস্ত করতে হবে এবং তার সংগে ৪ (চার) কপি ফোটোর উপরে নাম লেখা ও প্রত্যয়িত করা থাকবে।

রেপসিড তেলের টিন ঃ সমবায়িকার পরিবর্তে রেশন দোকানে

ভোজ্য তেল সরবরাহের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমদানীকৃত রেপসীড তেলের ৫ কেজি এবং ২ কেজির টিনগুলি যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যায় এবং প্রকৃত ব্যবহারকারীদের কাছে আরও সুষমভাবে পৌছনো যায়, তার জন্যে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

(১) ১ নভেম্বর ১৯৮৭থেকে নতুন করে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় সমবায়িকা বা কনজিউমার্স হোলসেল কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে ৫ কেজি বা ২ কেজি রেপসীড তেলের টিন আর বিক্রয় হবে না। তবে তাঁদের কাছে ইতিপূর্বের বরাদ্দকৃত তেলের অবিক্রীত টিনগুলি অবশ্যই বিক্রয় করা চলবে। এছাড়া এখন থেকে শুধুমাত্র রেশন দোকান থেকেই এগুলি পাওয়া যাবে।

(২) পরিবার পিছু মাসে একটি ৫ (পাঁচ) কেজি তেলের টিন বা প্রতি পনেরো দিনে একটি ২ (দুই) কেজি তেলের টিন বিক্রয় করা যাবে তার বেশি নয়। এজন্যে ক্রেতাদের ক্যাশ মেমো রেখে দিতে হবে যাতে দোকানে সময়মতো প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যায়। এই আদেশ ২ নভেম্বর ১৯৮৭ থেকে কার্যকর হবে।

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

* সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক।

* জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন
বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনসনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবির নিরসন ইত্যাদি প্রসংগে।

*** শিশুকল্যাণ ও মাতৃমংগল**
কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমংগল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক।

*** কাকে সংবাদ পৌছে দেবেন**
শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্‌সপেকটর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

*** কতদিনের মধ্যে**
শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন 'মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে' সংবাদ পৌছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায় ও সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর লিখিত ভারত ও ভূমন্ডল, ১ম খন্ড (ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য) এর নবম সংস্করণের ৬৫ পৃষ্ঠায় কোচবিহারের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা অসত্য। বিভ্রান্তিমূলক এবং কিশোর-কিশোরীদের এই ধরনের ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া গুরুতর অপরাধের বলে সরকার মনে করে। বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত ভাবে বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবংগ মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন

রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৫ বিঘা জমির উপর আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমার, বাগনান ১নং ব্লকের খালোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নব-নির্মিত বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন ও পূর্ত বিভাগের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ২৩ অক্টোবর '৮৭ দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাওড়ার জেলাশাসক শ্রীজি বালাচন্দ্রন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাগনানের বিধায়ক শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে ১১টি রুটের বাস বাগনান দিয়ে যাতায়াত করলেও এ যাবত কোনও টার্মিনাস না থাকার জন্য বহু মানুষকে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছিল। উদ্বোধনের ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আশা পূর্ণ হল।

উদ্বোধক শ্রীবালাচন্দ্রন নব নির্মিত এই টার্মিনাসটিকে আরও সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসককে কার্যকারি সভাপতি করে টার্মিনাসটি দেখাশুনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

বন্যপ্রাণী সপ্তাহ–১৯৮৭

গত ১৬.১০.৮৭ তারিখে সকালে বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ প্রাঙ্গণে "বন্যপ্রাণী সপ্তাহ-১৯৮৭"-র উদ্বোধন করেন বাঁকুড়ার বিধায়ক শ্রীপার্থ দে।

শ্রী দে তাঁর ভাষণে বলেন বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে শুধু অরণ্য কেন, মানুষও লুন্ঠিত হচ্ছে তাই সকলকে সজাগ হতে হবে।

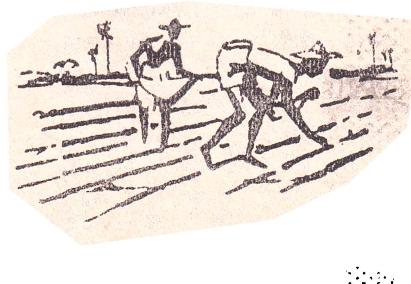
প্রধান অতিথির ভাষণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ রায় বলেন বন্যপ্রাণী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকা থেকে বঞ্চিত সম্পদ হ্রাসের ফলে আগামী দিনগুলি কত ভয়ংকর হয়ে উঠবে তার বক্তব্যে সেটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বন সৃজন হলে বন্যপ্রাণী ফিরে আসবে কিন্তু যে প্রজাতি চিরদিনের তরে পৃথিবী হতে লুপ্ত হয়ে গেল তাদের আমরা আর ফিরে পাব না। অন্যান্যদের মধ্যে মুখ্য বনপাল বক্তব্য রাখেন।

গত ১৪.১০.৮৭ তারিখে বাঁকুড়া জেলা তথ্য কেন্দ্রে যে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা হয়, তাতে অংশগ্রহণকারী ১২ বছরের নিচে শিশুদের পুরস্কার বিতরণ করেন বনমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল একটি প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পী।

বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে অরণ্যের তথা বন্যপ্রাণীর উপরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে।

মিত্রায়নের দান

সম্প্রতি যাদবপুরের গড়ফা অঞ্চলের 'মিত্রায়ন' সাংস্কৃতিক সংস্থা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে দেড় হাজার টাকা প্রদান করেছে। বন্যাত্রাণের জন্য একটি অনুষ্ঠান করে এই অর্থ সংগৃহীত হয়।



আধুনিক শিল্প ছাড়া শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়

—পরিবহণ মন্ত্রী

গত ২৯ অক্টোবর '৮৭ শ্রমিকভবনে শ্রমিকদের সাধারণ সভায় রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী বলেন, আজকের পৃথিবীতে আধুনিক শিল্প ছাড়া শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন এ রাজ্যের সব শিল্পই পুরনো, নানা সমস্যা জর্জরিত। কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে নতুন আধুনিক শিল্প তো করেই নি, অন্যদের করতেও দেয় নি। তাই বামফ্রন্ট সরকার আধুনিক শিল্প স্থাপনে গুরুত্ব দিয়েছে। সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প স্থাপনে কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েও অস্বীকার করেছে। এত বড় শিল্প রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যৌথ উদ্যোগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্র অন্য রাজ্যে এই শিল্প গড়ে তুলছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে করতে অস্বীকার করছে। তাই এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বিকশিত করার দায়িত্ব শ্রমিকদের নিতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন রায় বলেন, দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী যে অধিকার অর্জন করেছে, এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই অধিকারগুলি সুরক্ষিত। ওয়েবেলের শ্রমিকরা গোড়া থেকেই সেই অধিকার ভোগ করছেন। তাই তাদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে। শুধু চাকরি করার মনোভাব নয়, শিল্পের উন্নতি, বিকাশ ও সম্প্রসারণের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এটা করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেই। দায়িত্বশীল শ্রমিক হিসেবে সেকাজ সার্থকভাবে করতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অমর গাংগুলি।

মৎস্যজীবীদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস

৩রা নভেম্বর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের গরিব মানুষের উপকার করাই বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য। হাওড়ার শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দেউলী গ্রামে মৎস্যজীবীদের ১০০টি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস উপলক্ষে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী কিরণ্ময় নন্দ একথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জি। কিরণ্ময় নন্দ বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য জাতির উন্নয়ন তহবিল প্রকল্পের অন্তর্গত এই গৃহনির্মাণের জন্য মোট ব্যয় হবে ১২,৮২,৪০০ টাকা, যার অর্ধেক দেবে কেন্দ্র, অর্ধেক রাজ্য সরকার। ১০০টা বাড়ি ছাড়াও ৫টি টিউবওয়েল, ১টা পাকা রাস্তা, ১টা কমিউনিটি হল এবং ১টা কনসিউমার স্টোর এই প্রকল্পের মধ্যে থাকবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রসংঘ এ বছরটাকে বাসস্থান বর্ষের জন্য চিহ্নিত করেছে। ভারতেও এই প্রকল্প প্রথম চালু হচ্ছে। হাওড়া ছাড়াও ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরেও একইরকম প্রকল্প হবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা একাজ শেষ করার আশা রাখি। তিনি বলেন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (আর এল ই জি পি) অনুযায়ী গতবছর আমরা ৮০০০ বাড়ি করেছি, এবছরও ৮০০০ বাড়ি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এর জন্য মোট ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। নন্দ আরো বলেন, ব্যাঙ্ক ধনীদের ঋণ দিচ্ছে কিন্তু গরিবদের দিচ্ছে না। বামফ্রন্টের জনপ্রিয় কর্মসূচীর ফলে বহু মানুষ আজ মৎস্যচাষে এগিয়ে এসেছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি মৎস্যচাষীদের ধন্যবাদ জানান। স্থানীয় বিধায়ক গৌরহরি আদক বলেন, উক্ত প্রকল্পটির নাম রাখা হয়েছে 'ইন্দিরা আবাসন'। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্য আধিকারিক অরুণ বসু, সুশীল দিন্ডা প্রমুখ।

কল্যাণপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত মতিমালা গ্রামের শরৎচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬টি মৎস্যজীবী গ্রুপ ও ওরফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩টি মৎস্যজীবী গ্রুপকে নৌকা ও জাল বিতরণ করেন মৎস্যমন্ত্রী। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নিতাই আদক। এছাড়া মৎস্য প্রকল্পের ১৫ দিনের প্রশিক্ষণান্তে ৫১ জনকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।



হাওড়ার শ্যামপুরে মৎস্যজীবীদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন কিরণময় নন্দ। পাশে জেলা সভাধিপতি দেবী ব্যানার্জি।

পশুচিকিৎসা ক্যাম্প

সম্প্রতি উদয়নারায়ণপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশন হুগলী জেলার আহ্বানে উদয়নারায়ণপুর ব্লকের অন্তর্গত খিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনারায়ণচক, পূর্বপাড়া এবং কমলচকে ক্যাম্প করে ৭৯০ টি গবাদিপশু পাখিকে চিকিৎসা করা হয়। গো বসন্তের টিকা ছাড়াও প্রতিষেধক টিকা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক, প্রাক্তন প্রধান ও সমিতির জেলা সম্পাদকসহ বহু সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মসূচী পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

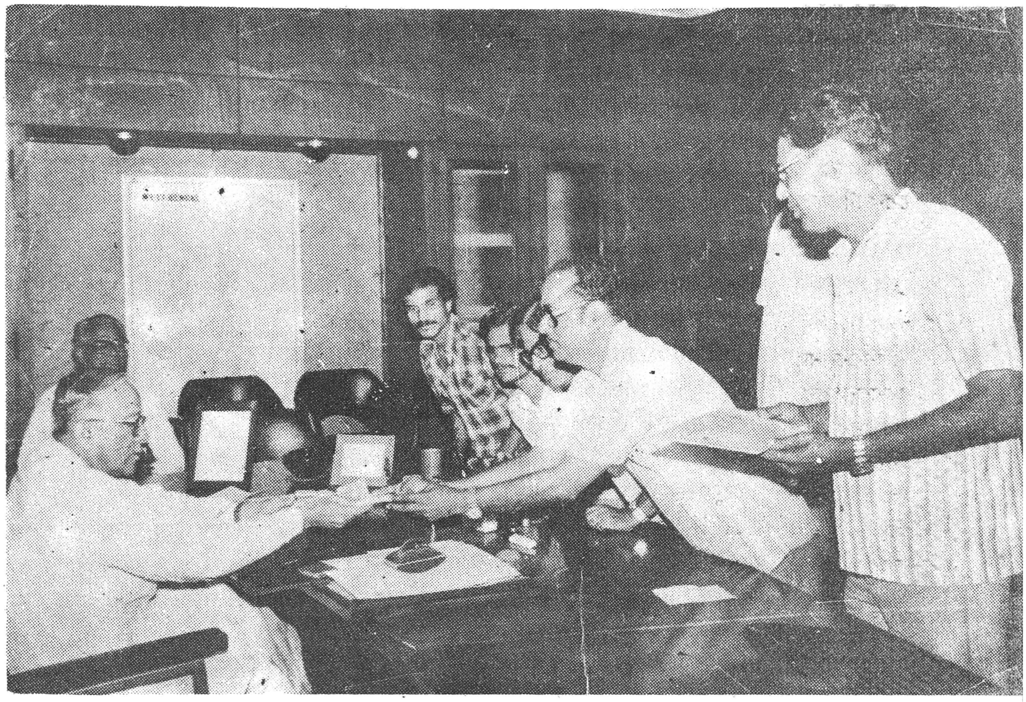
মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

একজন সাধারণ সরকারি কর্মীর মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে দান

বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাসকের অফিসের একজন সাধারণ সরকারি কর্মী শ্রীজগৎচরণ দাস তাঁর পূজার অনুদানের তিনশত টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য সম্প্রতি নিকট উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীত্রিলোচন সিং এর নিকট প্রদান করেছেন। শ্রীদাস একজন সাধারণ সরকারি কর্মী এবং "সরকারি শিকারী" পদে নিযুক্ত আছেন।

সহযাত্রী গাছতলা বাস প্যাসেঞ্জারস্ এ্যাসোসিয়েশনের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

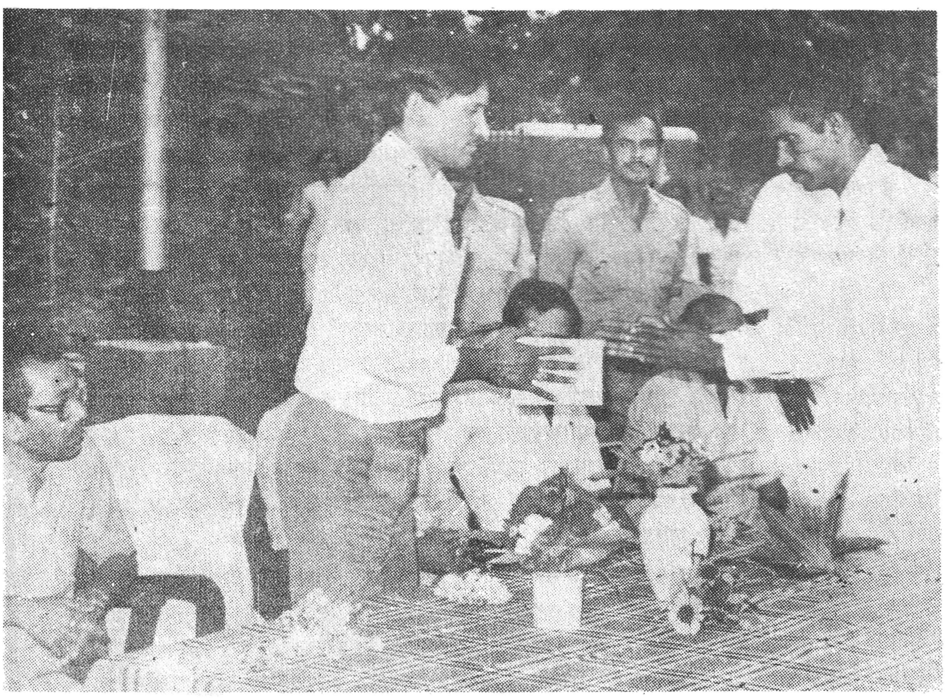
গত ২০ অক্টোবর (১৯৮৭) সহযাত্রী (গাছতলা বাস প্যাসেঞ্জারস্ এ্যাসোশিয়েসন, কলিকাতা-৪০) বন্যার্তদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৭০১ টাকার একটি চেক সংস্থার পক্ষে সভাপতি শ্রীসঞ্জিতকুমার দাস মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে অর্পণ করছেন। পাশে শ্রীজয়ন্তকুমার সেন (সংস্কৃতি সম্পাদক) শ্রীসমীরকান্তি আচার্য, শ্রীপীযূষ দত্ত এবং তপন রায়চৌধুরী (ক্রীড়া সম্পাদক)। মুখ্যমন্ত্রীর বামে উপবিষ্ট স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর।



২০ অক্টোবর ৮৭ সহযাত্রী গাছতলা বাস প্যাসেঞ্জারস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শ্রীঅমিত কুমার দাস মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বন্যাত্রাণ বাবদ ৭০১ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন।

বন্যার্তদের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

গত ২৯ অক্টোবর '৮৭ পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক কৃত্যক যোগাযোগ আধিকারিক বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ৫০১ টাকা ও কালাহাণ্ডির খরাপীড়িত মানুষদের সাহায্যার্থে ৫০১ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেবার জন্য স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন।



পুরুলিয়া কারাবাসীদের পক্ষে শ্রীকালীপদ মাহাতো পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক (পশ্চিম) শ্রীশৈলেন চন্দ্র দত্তের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী[illegible] তহবিলে দান করছেন।

কারাবন্দীদের ৫০১ টাকা দান

গত ২৮ অক্টোবর '৮৭ পুরুলিয়া জেলা কারাগারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক (পশ্চিম) শ্রীশৈলেন চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মাধ্যমে পুরুলিয়া কারাবন্দীদের পক্ষে শ্রীকালীপদ মাহাতো মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নগদ ৫০১ টাকা দান করেন। কারাবন্দীগণ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দুর্গাপূজার আয়োজন করেন এবং দুর্গাপূজার খরচ কমিয়ে এই অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন। সদর মহকুমা শাসক (পশ্চিম) শ্রীদত্ত তাঁর ভাষণে কারাবন্দীদের এই মহৎ প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, কারা চিকিৎসা আধিকারিক ও কারাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ছাত্র- ছাত্রীদের সাহায্য

সম্প্রতি স্থানীয় মুন্ডলিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কোদালপুর উত্তম চরণ প্রাইমারি স্কুল ৫১ টাকা, সোনামাগুরী প্রাইমারি স্কুল ৫০ টাকা, এবং আহেরিপাতা প্রাইমারি স্কুল বন্যাত্রাণে ২৫ টাকা দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে ওই টাকা বিধায়ক মণীন্দ্র জানার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে প্রদান করে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

শ্রীমৃণাল দাস

(দুই)

পশ্চিমবাংলার তাঁত, পাওয়ারলুম, ইটভাটা, বিড়ি নির্মাণ, টেলারিং বেকারি, ধানকল, কাঠকল তেলকল, ট্যানারি, প্রেস, প্লাস্টিক, কাঁচ, ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং, সাবান, পাথর কল, বাস-লরি-টেম্পো, রিকশা, অটো প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন বা অসংগঠিত শিল্পের সাথে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক যুক্ত অর্থাৎ সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র পোর্ট-ডক, রেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত, চটকল, কাপড়কল, সুতাকল, খনি, বড় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, ইলেকট্রনিক্স, প্রভৃতি বৃহৎ সংগঠিত শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ১০ গুণ। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন প্রমাণ করেছে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর এক অপরিসীম বিপ্লবী ভূমিকা আছে। সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের বুর্জোয়াশ্রেণীকে আঘাত করার শক্তি অনেক বেশি। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর এই অংশের মধ্যে সংগঠন, চেতনা ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে কম গুরুত্ব দিলে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর রণকৌশল হলো, তার শ্রেণীর সব স্তরকে সমবেত করে শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে তার সমস্ত স্তরকে সমবেত করে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চায়। ভারতবর্ষের সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাস অনুসারে শ্রমিকশ্রেণী ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের মিত্র হিসাবেও পেতে চায়।

১৯২৬ সালে চীনের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আধুনিক শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লাখ। প্রধানতঃ রেল, খনি, জাহাজ নির্মাণ, যানবাহন ও সুতাকল এই পাঁচটি শিল্পেই বিশ লাখ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৫ সালে আধুনিক শিল্প শ্রমিক উদ্ভব বর্ণনা করতে গিয়ে মাও পুনরায় বলেছিলেন, "চীনা সর্বহারাদের মধ্যে আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা হচ্ছে ২৫-৩০ লাখ। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এবং হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও শহরের দোকান কর্মচারীদের মোট সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ।" সুতরাং ১৯৩৫ সালে চীনের মূল সংগঠিত শিল্পে শ্রমিক সংখ্যার থেকে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ বেশি ছিল। আবার মূল শিল্পের শ্রমিকদের বৃহৎ অংশ বিদেশী মালিকদের 'শিল্প দাস' ছিল। ঐতিহাসিক কারণে চানের শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল ক্ষুদ্রায়তণ শিল্পের শ্রমিক। কিন্তু এই শ্রমিকরা চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবী চেতনায় নিজেকে বিকশিত করে চীনা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে।

রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টু-ডে' বইতে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে ভারতে ১৯২১ সালে প্লানটেশন, খনি ও যানবাহন শিল্পে মোট যে শ্রমিক সংখ্যা ছিল তার দশ শতাংশের কিছু বেশি শ্রমিক সংগঠিত সংস্থাসমূহে নিযুক্ত ছিল। ১৯৩১ সালে শিল্পসমূহে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ছিল মোট ২০ কোটি ৬১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬ শত ৮৯ জন। তারপর থেকে পাঁচ দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যার ফলে শিল্পগত অগ্রগতির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আরও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯২৫ সালে ১৮ মে তারিখে পূর্ব দেশসমূহে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতায় স্তালিন বলেছিলেন, "প্রথমত, মরক্কোর মত দেশ রয়েছে যেখানে প্রায় কোন সর্বহারাই নেই এবং যেগুলো শিল্পগতভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুন্নত। দ্বিতীয়ত, চীন এবং ইজিপ্তের মত দেশ রয়েছে, যেগুলি শিল্পগতভাবে কম উন্নত এবং যাদের সর্বহারাদের সংখ্যা অপেক্ষকৃত কম। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের মত দেশ রয়েছে যারা পুঁজিগতভাবে অল্পবিস্তর উন্নত এবং যাদের দেশী সর্বহারা কম বেশি বহু সংখ্যক। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ এবং প্রাক বিপ্লব যুগের চীনের মধ্যে ধনতন্ত্র এবং আধুনিক শিল্পের অগ্রগতিতে পার্থক্য ঘটলেও বর্তমান সময়কালে ভারতে সংগঠিত আধুনিক শিল্পের সামনে এক গভীর সংকট নেমে এসেছে। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্পক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকারকে আরও প্রসারিত ও সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। বিদেশ থেকে অতি উন্নত মানের প্রযুক্তি আমদানি করে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিশালী অংশ তার আধুনিক শিল্পকে অতি আধুনিক প্রধান শিল্পে রূপান্তরিত করার সংকল্প বর্তমান শিল্প সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। কয়েক হাজার বৃহৎ সংগঠিত শিল্প আজ বন্ধ। কয়েক লক্ষ শ্রমিক আজ বেকার।

ভারতবর্ষের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর ও আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারতন্ত্রের সাথে মৈত্রীস্থাপন করে এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি করে রাষ্ট্র-নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রকে অক্ষত রেখে দেশে ধনতন্ত্র গড়া যায় না। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে থাকা সত্ত্বেও গত চল্লিশ বছরে দেশের ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় নি। বর্তমান ভারতবর্ষের শিল্প-বুর্জোয়াদের বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। শ্রমিকশ্রেণীকে জাতিভেদের পাঁকে নিমজ্জিত করতে চায়, বহু কল-কারখানার অভ্যন্তরে অথবা শ্রমিক বস্তিতে দেব-দেবীর মন্দির স্থাপন করে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, ধ্যান-ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর মনে বদ্ধমূল করে গড়ে তলতে চায় এবং প্রগতিশীল বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎসাহবোধ করে না। এক সময়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী আজ আর সেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে নেতৃত্বে ছেড়ে দেবে না। আমাদের দেশে সামন্তশ্রেণীর সাথে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা নৈতিক মনোবলও হারিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সাথে ব্যবসায়ে লিপ্ত দেশীয় ব্যবসায়ীরা যাদের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের সামন্ততান্ত্রিক মিত্র হলো কমপ্রাডর বুর্জোয়া। ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরে এই কমপ্রাডর বুর্জোয়া এবং সামন্তশ্রেণীর অংশবিশেষ শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণীতে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে, আজও বহু শিল্প-বুর্জোয়ার জমির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির উপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি অক্ষত আছে। প্রাক ধনতান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি অক্ষত আছে। প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজের সব অবশেষগুলি ভারতের অধিকাংশ গ্রামগুলিকে যুগ যুগ ধরে পশ্চাৎপদতার মধ্যে বেঁধে রেখেছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের অধিকাংশই গ্রামভিত্তিক এবং এখানে শোষণের চরিত্র হলো মূলত সামন্ততান্ত্রিক।

ভারতবর্ষে সংগঠিত শিল্পের শ্রমবাহিনীর তুলনায় অসংগঠিত শিল্পে শ্রমবাহিনী প্রায় ১৫ গুণ বেশি এবং পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১০ গুণ। গ্রামীণ শিল্প শ্রমিকদের লক্ষ লক্ষ পুরোহিতদের অনুগামী, সংস্কারাচ্ছন্ন। মূল শ্রমিকশ্রেণী তার নিজ শ্রেণীর পশ্চাদপদ অংশকে শিক্ষিত করে তোলা ও বিপ্লবী চেতনায় বিকশিত করে তোলার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে সংসদীয়

নির্বাচনগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংসদের অসারতা এবং এই সংসদ যে তাদের কোন কল্যাণ করতে পারে না এই উপলব্ধি দৃঢ়মূল হলেই শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশ আদর্শগতভাবে, রাজনীতির দিক থেকে বুর্জোয়া সংসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও একে বাতিল করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। সুতরাং বিভিন্ন নির্বাচনে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের বিরাট শ্রমবাহিনীর ভূমিকা খাটো করে দেখা সমীচিন নয়। গ্রামের শ্রেণী শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই অসংগঠিত শ্রমবাহিনী এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও পালন করতে পারে। তাই এদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা দরকার এবং সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই বিরাট শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে চেতনা বিকাশের প্রধান মাধ্যম হলো সংগঠন ও আন্দোলন এবং আন্দোলন ও সংগঠন। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা অবশ্যই এই কাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ক্ষুদ্রায়তন ও কুঠির শিল্প এবং এই শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাতে এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে হবে। গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শ্রমিকদের একাংশ বংশপরম্পরায় শ্রমিক, অপর অংশ অতি সম্প্রতি কৃষক থেকে শ্রমিকশ্রেণীতে যুক্ত হয়েছে এবং অপর অংশ শ্রমিক হলেও কৃষির সাথেও ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। কম মজুরি, অমানুষিক শোষণের যোগফল হলো অসংগঠিত শ্রমের ক্ষেত্র। কিন্তু তা সত্বেও এই শ্রমক্ষেত্রের শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে আছে চরম দোদুল্যমানতা এবং সামন্ত মতাদর্শের ধারক এবং অপর অংশের মনে আছে তীব্র শ্রেণীঘৃণা ও জংগী মনোভাব। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ক্ষেত্রের একাংশে উদ্যোগীদের প্রচুর মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের জন্য কোন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো গড়ে ওঠেনি অথবা কোথাও কোথাও সরকার নির্দেশিত মজুরি কাঠামো থাকলেও তা কার্যকর হয় না। ট্রেড ইউনিয়ন আইনের কোন সুযোগ-সুবিধাও শ্রমিকরা পায় না। এর প্রধান কারণ হলো এখানে শ্রমিকরা অসংগঠিত এবং আন্দোলন সংগ্রামের অভাব। আবার এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলি একচেটিয়া ও বৃহৎ বুর্জোয়ার আক্রমণে সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের এক একটি শিল্প সম্পর্কে গভীরভাবে অনুশীলন এবং সমীক্ষা অন্তে দাবিসনদ ও আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন।

ধনতন্ত্র কৃষক সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরভেদ নিয়ে এসেছে। ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক এই স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আছে। বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা কবলিত বাজারের লুটের শিকার হবার দরুণ ধনী ও মাঝারি কৃষক প্রায়ই বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের অনুসৃত পীড়নমূলক নীতিসমূহের বিরুদ্ধে চলে আসে। গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর জমিদারদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত। বর্তমান সমাজে তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই তারা হবে শ্রমিকশ্রেণীর মূল মিত্র। একই সংগঠনের অভ্যন্তরে থেকে ক্ষেত্রমজুররা মজুরি বৃদ্ধির জন্য অতীতে পশ্চিমবাংলার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে কিন্তু কৃষক সমিতির অভ্যন্তরে সাংগঠনিক সংকট সৃষ্টি হয় নি অথবা কৃষক সমাজ শত্রু শিবিরে চলে না যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মজুরি বৃদ্ধির দাবির সাথে ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ ও সেচের দাবিও ছিল ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যাদের বিদেশী একচেটিয়াদের সাথে সংযোগ নেই, যারা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে না পরন্তু একচেটিয়াদের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার ফলে বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চলে আসছে বাধ্য হয়। শ্রমিকশ্রেণী এই শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাদের সমস্যাগুলি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অনুশীলন করে থাকে। শ্রমিশ্রেণী তার শ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই অংশের সাথে যেমন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় না আবার অপর দিকে এই শক্তির সমাবেশে একচেটিয়া বৃহৎ বুর্জোয়ার হাত শক্তিশালী হোক তাও চায় না। সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সমস্যাগুলি সমাধানে উদ্যোগী হতে পারে ও বৃহৎ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য স্তরকে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহায্য করে।

ক্ষুদ্রায়তন বা কুটীর শিল্পে কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠলেও সামগ্রিকতা লাভ করতে পারে নি এবং দুই এক বছরের মধ্যে ইউনিয়নগুলি কার্যকরী ভূমিকাও বিলীন হয়ে গেছে। উৎসাহ নিয়ে শ্রমিকরা এসেছিল অনেকে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে গেছে। কিন্তু কেন? (ক) ক্ষুদ্র-কুটীর শিল্প এবং সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের চারিত্রিক বিভিন্ন স্মরণে না রেখেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের একাংশের একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইউনিয়ন গড়ে তোলা। (খ) শিল্পকে বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা না করে যা একটি আঞ্চলিক ইউনিয়ন নেতৃত্বের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ, দাবিসনদের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করা অথবা না করা। (গ) মালিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে দৃঢ় মানসিকতা গড়ে না তোলা এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের পেছনে নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের সমবেত করার দুর্বলতা যা একটি (আঞ্চলিক/জেলা) ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব নয়। (ঘ) ধৈর্যশীল, শিক্ষিত বিচক্ষণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকের অভাব। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শ্রমিকদের সার্থকভাবে সংগঠিত করতে হলে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা এবং দাবিসনদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। একটি রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট শ্রমিক দলকে সংগঠিত করা এক জটিল শ্রমসাধ্য কাজ। এই কাজে যদি নতুন নতুন সংগঠক ও কর্মীদের নিয়োগ করা না যায়, যদি শুধুমাত্র সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের উপরই এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তবে বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতাই বলবে যে সাংগঠনিক অগ্রগতির সম্ভাবনা কম। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এক একটি শাখায় স্বতন্ত্র ইউনিয়নগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন দাবিসনদের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নৈরাজ্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আন্দোলনের ফরম কি হবে? কত দূর যাওয়া যাবে? কোথায় নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে? কোথায় দৃঢ়তা দেখাতে হবে? বিভিন্ন প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্যতার ফলেই আসে সাংগঠনিক নৈরাজ্য। একটি বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম কর্তব্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা গড়ে তোলা। এই চেতনা বিকাশের কাজ নিচে থেকে হয় না উপর থেকে অর্থাৎ একটি কেন্দ্র থেকেই গড়ে তুলতে হয়। যেমন খুশি তেমন চলার নীতি আর যাই হোক বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

ক্ষুদ্র-কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী এবং সামগ্রিক শ্রমিক আন্দোলনে সংগঠক বা নেতৃত্বের প্রশ্ন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঢঙে উত্থাপিত হয় থাকে। শ্রমিক থেকে ওঠা নেতৃত্বে? ছাত্র-যুব থেকে আসা নেতৃত্ব? মধ্যবিত্ত থেকে আসা নেতৃত্ব?—কোন্‌টা আমাদের গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে লেনিনবাদী ধারণা কী? যে কেন সামাজিক স্তর থেকে আসা ব্যক্তি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দর্শন মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে কি না এবং এই বিপ্লবী মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেশ্রমিকশ্রেণীর সাথে একাত্ম হচ্ছে কিনা। নেতৃত্ব ও সংগঠকের অন্যান্য গুণাবলীর সাথে যদি এই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের ফারাক থাকে তাহলে কোন ব্যক্তি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব বা সংগঠকের মর্যাদা পেতে পারে না। অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিরাট শ্রমবাহিনীকে সংগঠিত করার গুরুত্ব অনেকে স্বীকার করেও বলে থাকেন 'লোক নেই।' কিন্তু অসংখ্য লোক আছে। রাজনীতি ও সংগঠন সম্পর্কে অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান আছে এমন বহু তরুণ আমাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করে। এদের পরিকল্পিতভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করা কাজে নিয়োগ করে ভবিষ্যতে এক একজন দক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী গড়ে তোলা সম্ভব।

১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। ১৯০১ সালে মতবোদা পত্রিকায় 'সংগঠন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এক সন্ত্রাসবাদী লেখেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শহরের ছাত্ররা কোন গ্রীষ্ম বা অন্য ছুটির বন্ধে বাড়ির দিকে রওনা হওয়া মাত্রই শ্রমিকদের আন্দোলন থেমে পড়ে। বাইরে থেকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হয় যে শ্রমিক আন্দোলনকে সেটা

কি সত্যিকারের শক্তি হয়ে উঠতে পারে? .....ছাত্ররাও চলে যায় আর সব কিছু থেমে পড়ে। কমরেড লেনিন ইস্‌কা পত্রিকায় এই অভিমতের তীব্র সমালোচনা করে লেখেন 'পেশাদার বিপ্লবীদের একটা কমিটি আমাদের চাই, সে পেশাদার বিপ্লবী হওয়ার যোগ্য ছাত্রেরই থাক শ্রমিকেরই থাক—তাতে কিছু এসে যায় না। জিজ্ঞেস করতে পারি আমাদের শ্রমিকদের কীভাবে 'ঠেলে নিয়ে চলেছে' আমাদের ছাত্ররা? নিজেদের যে ছিটেফোঁটা রাজনৈতিক জ্ঞান আছে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার যে টুকরো-টাকরো তারা চেষ্টা করে জোগাড় করেছে, সেইটুকু শ্রমিকদের কাছে হাজির করবার মারফতেই শুধু ছাত্ররা শ্রমিকদের 'ঠেলে নিয়ে চলেছে' এ ধরনের বাইরে থেকে 'ঠেলে নিয়ে চলা' প্রয়োজনের বেশি তো কখনোই হয় নি, বরং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হয়েছে, আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্তই কম হয়েছে। লেনিন আরও বলেছেন যে, শ্রমিকদের কাছে শ্রেণী রাজনৈতিক চেতনা বাইরে থেকেই, অর্থাৎ একমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের, শ্রমিক এবং মালিকের পারস্পরিক সম্পর্কের বাইরে থেকেই সঞ্চারিত করা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে বড় ও মাঝারি শিল্প যেমন সংকটের আবর্তে পড়েছে অনুরূপভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও সংকটে। বিরাট শ্রমবাহিনী নতুন করে বেকারবাহিনীর সাথে যুক্ত হচ্ছে। বড় ও মাঝারি শিল্পের বেকার শ্রমিকরা ক্ষুদ্র কুটি শিল্পের আঙিনায় প্রবেশ করছে। কোথাও কোথাও শ্রমের মূল্য আরও কমে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রায়তণ শিল্পের শ্রমিকদের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মানের আরও অবনতি ঘটছে। বন্ধ কলকারখানা খোলা, বেকারীর অবসান এবং পশ্চিমবাংলায় শিল্পায়ণের দাবিতে গড়ে ওঠা সংগ্রামে ক্ষুদ্রায়তণ শিল্প শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। মূল সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের সাথে অসংগঠিত শিল্পের বিরাট শ্রমবাহিনীকে যুক্ত করা এবং গ্রামীণ শ্রমিকদের কৃষকসমাজের সাথে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তোলার কাছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, সংগঠক ও কর্মীরা যদি গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় সংগঠন ও আন্দোলনগত মত পার্থক্য। কখনও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ, কখনও সঠিক সিদ্ধান্ত না মানার প্রবণতা, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্রমিশ্রেণীর শৃংখলা ভাঙার প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংস্কারবাদের পথে নিয়ে যাওয়া। শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের প্রতি বাঁকে, সংগ্রামের প্রতিটি তীব্র পর্যায়ে এবং সংকটের গভীরতায় শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিকোণ, রীতিনীতি ও ভাবাবেগের পার্থক্য অনিবার্যভাবে সুনির্দিষ্ট মত পার্থক্যের সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার মতাদর্শের চাপ এই সমস্ত মতপার্থক্যকে তীব্র করে তোলে। শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব আছে। কমরেড স্তালিন (৯ম খন্ড) শ্রমিক সাধারণকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন: প্রথম স্তরে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর মূল জনসংখ্যা, তার অন্তঃসার, তার স্থায়ী অংশ, বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী জনগণ যাদের শরীরে রয়েছে খাঁটি শ্রমিকের রক্ত, যারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর সাথে বহু পূর্বেই যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর এই স্তরই মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দুর্গপ্রকার। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে কৃষক সমাজ, পেটি-বুর্জোয়া বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভৃতি অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলি থেকে নবাগতরা। এরা পূর্বে অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ছিল, অতি সম্প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাদের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, তাদের চঞ্চলমতিত্ব ও তাদের দোদুল্যমানতা সাথে করে বয়ে এনেছে। সমস্ত প্রকারের নৈরাজ্যবাদী, আধা-নৈরাজ্যবাদী এবং উগ্র বাম উপদলগুলির সর্বাপেক্ষা অনুকূল হলো এই স্তর। তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে রয়েছে অভিজাত শ্রমজীবীরা, এরা শ্রমিকশ্রেণীর ওপরের স্তর, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছল বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে আপোসের ঝোঁক, তাঁদের শক্তির সাথে নিজেদের খাঁপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবল আসক্তি এবং জীবনের স্বচ্ছল বিধানের জন্য উদ্বেগ এদের রয়েছে। পরিপূর্ণ সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদীদের জন্য এই স্তর সবচেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর যে স্তর বিপ্লবী উপাদানে সমৃদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নকে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে সংগঠিত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলনে বিভিন্ন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

(৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

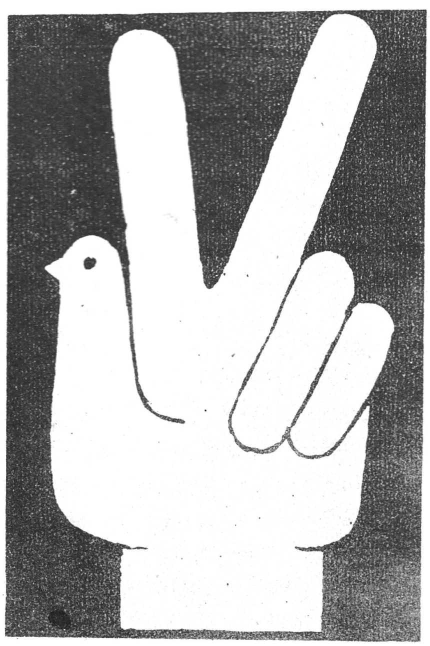
উদ্যোগের উদ্বেগ

বোঝা দরকার। তাছাড়া 'স্কীম' অনুমোদিত না হলে সরকারি সহযোগিতায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। অতএব 'স্কীম' তৈরীতে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

এর পরেও অনেক কাজ। যেমন কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প হলে যথাস্থানে তার নাম পঞ্জীভুক্ত করা। বড় শিল্প হলে সে কাজ ছাড়াও ব্যবসা সংক্রান্ত অনুজ্ঞাপত্র নিতে হবে। বড় খালি জমিতে কারখানা করতে হলে ঘরবাড়ি তৈরীর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। যন্ত্রপাতি নিজে পুরো না কিনে 'হায়ার পারচেজ' করতে হলে তার জন্য নির্দিষ্ট সংস্থায় যেতে হবে। কারিগর ও কাঁচামাল সন্ধান শেষ হলে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রায় প্রতিটি শিল্পের জন্যই এক এক নিয়ম। তবুও এ যাবৎ বলা ব্যাপারগুলো ঠিক হলে মোটামুটি কারখানায় উৎপাদন শুরু করা যেতে পারে। আর তারপরই আসে তৈরী মাল বিক্রির কথা। বিক্রির ব্যবস্থা ঠিক থাকলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এগোতে থাকবে। সংগে শুধু থাকবে কিছু দৈনন্দিন সমস্যা। সংক্ষেপে বললে, এটাই শিল্প গড়ার মোটামুটি একটা চিত্র।

যিনি ধৈর্যশীল ও সাবধানী, যিনি বিচার বিশ্লেষণ না করে আবেগের দ্বারা পরিচালিত হন না, যিনি নিয়োজিত কর্মীদের প্রতি সুবিচার করতে চেষ্টা করেন, আমাদের মতে তিনি শিল্প গড়ার পক্ষে উপযুক্ত।





ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব, বিস্তৃত পশ্চাৎভূমি-সেবিত বন্দর, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও কারিগরি নৈপুণ্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও পরাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ অভিলষিত শিল্প সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক শিল্পনীতির ফলেই এ রাজ্যের শিল্প-প্রসারের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। মাশুল সমীকরণ নীতি বিশেষ করে এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় নিয়ে আসে। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও শিল্পের উন্নতি ছাড়া আধুনিক যুগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অভিপ্রায়-পত্রের অনুমোদন ও আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া বৃহৎ শিল্প স্থাপন অসম্ভব। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বর্তমান রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের দিকে বিশেষ করে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারে নজর দিয়েছে। কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ছাড়া এ রাজ্যের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু কুটির শিল্পই হোক বা ক্ষুদ্র শিল্পই হোক—তার উদ্যোগের সাফল্য অর্জনে বিভিন্ন সংস্থা ও পরিকাঠামোর সহযোগিতা প্রয়োজন।

রাজ্য সরকারের বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' সেক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যের কথা মনে রেখেই এই বিভাগের প্রবর্তন করছে। দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্পোন্নয়ন গবেষণায় রত এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ্‌গণ এই বিভাগে নিয়মিত নিবন্ধ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা শিল্প গড়ার তথ্যের পরিবেষণে শুধু যে অভিজ্ঞ তাই নয়, পারদর্শীও বটে। সাধারণ পাঠক এবং যেসব যুবকযুবতী শিল্প গড়তে আগ্রহী তাঁরা সকলেই এই বিভাগটিতে ক্রমপ্রকাশমান নিবন্ধগুলি পাঠে উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। —সম্পাদক

উদ্যোগের উদ্বেগ

শ্রীসনত সিন্‌হা, শ্রীপ্রবোধ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রভাস শেঠ

অনেক শিল্পোদ্যোগী আসেন বিভিন্ন সরকারি অফিসে। তাঁদের নানা ধরন। অনেক সময় তুচ্ছ বা সামান্য কারণে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আসলে তো দু-পক্ষই সহযোগিতা করতে চান, তাহলে কেন আসে এসব সমস্যা? কিভাবে শিল্পোদ্যোগীরা সহজে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন? সে সব নিয়ে আমরা এবার আলোচনার চেষ্টা করব। যে তথ্য প্রয়োজন সেটা পাওয়াই বড় কথা। কিন্তু পাবার পদ্ধতি ঠিকমত জানলে কাজ সহজ হয়। না হলে অযথা হয়রানি হতে হয়। প্রয়োজনীয় কোন খবরই মেলে না। ঠান্ডা মাথায় ভেবে এগোলে পরিশ্রম হবে কম। আখেরে লাভ হবে বেশী। আমরা প্রথমে কয়েক ধরনের শিল্পোদ্যোগীর পরিচয় দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কি কি ব্যবস্থা নিলে তাঁদের পক্ষে ভাল হয় তা বলতে চেষ্টা করব। সবশেষে মোটামুটি কি কি গুণ থাকলে, কি কি সাবধানতা নিলে সবদিক থেকে ভাল হয় সেটা প্রয়োজনমত জানাব।

একদল শিল্পোদ্যোগী খুব উৎসাহ নিয়ে হাজির হন। তাঁদের একজন হয়ত সত্যিই সহানুভূতিশীল একজন সরকারি কর্মীর কাছে হাজির হলেন। যথারীতি তিনি কি কারণে এলেন জানতে চাইলেন সেই কর্মীটি। তখনই বাধল-গোল। শিল্পোদ্যোগী যুবক হয়ত জানালেন যে তিনি একটা ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান। তখন প্রশ্ন হল, 'আপনি কী উৎপাদন করতে চান?' তিনি জানালেন যে সেটা জানতেই তিনি এখানে এসেছেন। প্রশ্নোত্তরে ধীরে ধীরে কি কি জানা গেল? জানা গেল এই যুবক সবেমাত্র স্নাতক হয়েছেন। তিনি একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তাঁর বাবা চাকরী করেন। তিনি চান ছেলেও চাকরী করুক। অথচ যুবকটি চান ব্যবসা করতে, শিল্প গড়তে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি জানেন না কি করবেন? অর্থাৎ কোন ব্যবসা করা উচিত। তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ভাবেন নি। পত্র পত্রিকা, রেডিও, টি.ভি. প্রভৃতিতে পড়ে শুনে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে যে ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকলে সরকারি অফিসে যোগাযোগ করলে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এখানে এসেছেন। ফলে কর্মীটি তাঁকে কি বলবেন? প্রথমত বললেন, 'আপনাকেই তো ঠিক করতে হবে কি উৎপাদন করবেন, কোথায় করবেন? তা না হলে তো মুশকিল?' যুবকটি বললেন, 'সে বিষয়ে আপনি কি কিছু সাহায্য করতে পারেন না?' কর্মীটি তখন বললেন, 'আমি হয়ত আপনাকে বাজারে যেসব জিনিসের চাহিদা বেশি আছে সেটুকু বলতে পারি। কিন্তু আপনাকেই ঠিক করতে হবে কোনটা আপনি করবেন। তাছাড়া যে জিনিস উৎপাদন করবেন তার একটা প্রাথমিক জ্ঞানও তো থাকতে হবে।'

যুবকটি একটু অসুবিধায় পড়লেন। তিনি বললেন, 'তাহলে যে শুনি যুবকেরা শিল্প গড়তে চাইলে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেটা তবে কি?'

শুরু হল সমস্যা। কর্মী ভদ্রলোক তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সব নীতি ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত নন। তিনি চান তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকুই পালন করতে। আবার যুবকটিও সব রকমের সাহায্য বলতে যে ব্যাখ্যা নিজে করেছেন সেটাই বোঝাতে থাকেন। ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়।

সহানুভূতিশীল কর্মীটি হয়ত যুবককে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তাঁর কোন জ্ঞান আছে কিনা জিগ্যেস করলেন। যুবকটি হয়ত বললেন, 'আমার পাড়ায় কয়েকটি প্লাস্টিক খেলনা তৈরীর কারখানা রয়েছে। ধরুন যদি ঐ ব্যবসাই করি?' কর্মী ভদ্রলোক জানালেন, 'প্লাস্টিক খেলনার বাজার বর্তমানে তেমন ভাল নয়, তবু যদি সেই জিনিসই তৈরী করতে চান প্রথমে

নিজের এলাকার কারখানাগুলো ঘুরে দেখুন। জানুন কি কি লাগে? কোথায় কাঁচামাল মেলে? কারিগর সহজে পাবেন কিনা? মেসিন কোথায় পাবেন? ডাইস কারা সরবরাহ করে? কোন ধরনের প্লাস্টিকের খেলনা বিক্রি করা বেশি লাভজনক? এসব তথ্য জোগাড় করে আসুন। এর পরে আপনাকে সাহায্য করব।'

যুবকটি বললেন, 'এত খোঁজ নিজে নিতে হলে আপনারা কি সাহায্য করলেন? সব জেনে গেলে তো আমিই সব পারব।' কর্মী ভদ্রলোক ধৈর্যশীল হয়ে বললেন, 'যা আপনাকে বলেছি সেগুলো সব জানলে দেখবেন ওতেও শিল্প গড়ার কাজ অনেক বাকি থাকছে। আপনাকে 'স্কীম্' করতে হবে, টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, বিভিন্ন লাইসেন্স করাতে হবে। আরো কত কি করতে হবে।'

যুবকটি একথায় সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর নিজস্ব বিরূপ ধারণা নিয়ে ফিরে গেলেন। অথচ কর্মী ভদ্রলোকের অপরাধ কি বলুন তো? তিনি তো তাঁর কর্তব্য করেছেন। অথচ যুবকটি ধৈর্যশীল হলে আখেরে তাঁরই লাভ হত। শিল্প গড়ার কাজে সত্যিই এগোতে পারতেন।

এবার ভাবা যাক্ সমস্যার মূলটা কোথায়? কেন একজন সাহায্য নিতে এসে বিরক্ত হলেন? কেনই বা অন্যজন সাহায্য করতে গিয়ে বিফল হলেন? দুজনের উদ্দেশ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল কি? কেন এমন হল? কিভাবে তা এড়ানো যেতে পারে? সমস্যা এসেছে কোন্ দিক থেকে? একটু ভাবলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

যে কোন কাজে নামার পেছনে একটা প্রস্তুতির দরকার। পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা ভালভাবে করতে হয়, বেড়াতে গেলে বিছানা, জিনিসপত্র ইত্যাদি গোছগাছ করা দরকার হয়। কারখানার কাজ শিখতে গেলে শিক্ষানবিশি করতে হয়। যিনি ব্যবসা করবেন বা শিল্প গড়বেন তিনি শুধু সরকারি সাহায্যেই সব কিছু করতে পারবেন, তা কি হয়? তাঁকেও অনেক সময় ব্যয় করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে।

কি পরিশ্রম তিনি করবেন? প্রথমেই যে কথাতে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন তাই ই তাঁকে করতে হবে। অর্থাৎ ঠিক করতে হবে কি ব্যবসা করবেন? কি জিনিস উৎপাদন করবেন? কীভাবে তিনি সেটা করবেন? বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পথে চলেন। তাই প্রাথমিক কথাটা বলা যায়, বাকিটা তাঁর নিজের ওপর। কিভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হয়ে ব্যবসা শিখতে হয় সেকথা আগেই বলেছি। অন্য পথের কথা বলি। সে পথ হল বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসাক্ষেত্রে যাওয়া ও কোন মালের চাহিদা কেমন খোঁজ নেওয়া। প্রথম প্রথম কোন চেনা লোক সংগী হলে ভাল হয়। তিনি তাঁর চেনা জায়গায় আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। তা না পেলে কিছু অসুবিধা হয়। তবে কাজে নামলে কয়েকদিনের মধ্যেই সব সহজ হতে থাকে। একদিন কয়েকটি জিনিস সম্বন্ধে পরিষ্কার চিত্র পেয়ে গেলে পরে নির্দিষ্ট একটি জিনিস বেছে নিতে পারবেন। প্রয়োজনে এই বিভাগের সহযোগিতা তখন নিতে পারেন, সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব।

এবার আর এক ধরনের শিল্পোদ্যোগীর কথা বলি। তাঁরা খুব চটপটে। বহুদিন ধরে তাঁরা বহু পরিশ্রম করে, তথ্য জেনে, সব কিছু ঠিক করেই তাঁরা এসেছেন। অনেক সুযোগ সুবিধা তাঁরা সহজেই পেয়ে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য অন্য। সেদিকে ঠিকঠাক নজর না পড়লে তাঁরা অনেকটাই এগোতে পারেন। কিন্তু আসলে তাঁরা কি? কিভাবে তাঁরা অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করেন?

খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এঁরা আসলে শিল্পোদ্যাগী নন। এঁরা ব্যবসায়ীদের সংগে যুক্ত। এঁরা ঠগ। এঁদের চিনতে না পেরে অনেক সরকারি কর্মী বিপদে পড়েন। যিনি একবার বিপদে পড়েছেন, তিনি পরবর্তীকালে কোন খাঁটি শিল্পোদ্যাগীকেও সন্দেহের চোখে দেখেন। ফলে সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু একের দোষে অন্যে কুফল ভোগ করে। এদের প্রতিরোধ করা খুব সহজ নয়।

আরো নানা রকমের শিল্পোদ্যোগী আছেন। সবার বিষয়ে আলোচনা না করে যাঁদের বিষয় জানানো বেশি দরকার তাঁদেরটাই জানাব। শিল্পোদ্যোগীরা তা থেকেই নিজেদের পথ ঠিক করে নিতে পারবেন।

এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা সর্বত্র সহায়তা পান। সব রকমের পরিবার থেকেই তাঁরা আসেন। সবাই কি সবকিছু জেনে আসেন? না, তা নয়। তাহলে তাঁদের কি বিশেষ গুণ থাকে? কেন তাঁরা সহযোগিতা পান সকলেরই? আসলে তাঁরা সহায়তা নিতেই আসেন। সংশ্লিষ্ট কর্মীকে না পেলে তিনি অধৈর্য না হয়ে সময় ব্যয় করতে রাজী, কিন্তু যে কাজে নেমেছেন সেটা সিদ্ধ তিনি করবেন এমন সহনশীলতা তাঁর আছে। আসলে আমরা সাধারণত অপরের কর্তব্যের দিকে নজর দিই, নিজেরটির দিকে নয়। ব্যবহারটি ভাল রেখে ধৈর্য ধরলে সফল হওয়া সহজ। যাঁর তথ্য দেবার কথা অকেজেদী কোন ধৈর্যশীল শিল্পোদ্যোগীকে বারবার ঘুরিয়েও শেষ পর্যন্ত দিতেই হবে। নতুবা স্বীকার করতে হবে তিনি তথ্য জোগাড় করতে পারেননি। অধৈর্য ব্যক্তিকে সহজে ফেরানো যায়। যিনি ধৈর্যশীল, সহনশীল তিনি সর্বত্র জিতে আসবেনই।

তথ্য জোগাড় হল। জানা গেল কি কি ব্যবসা করা যায়। সরকার কোন্ শিল্প স্থাপনে বিশেষ সহায়তা দিচ্ছেন, কোন্‌টাতে মোটেই উৎসাহ দিচ্ছেন না, ইত্যাদি নানান তথ্য। এখন কর্তব্য কি? এখন কর্তব্য হল সব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে দেখা। তা নিজের সুবিধে সুযোগ মত কাজে লাগানো। ধরুন, শিল্পবিহীন জেলায় যাঁর বসবাস, তাঁর সবচেয়ে সুবিধে নিজের জেলাতেই শিল্প স্থাপন করা।

তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করা খুব প্রয়োজনীয়। সামান্য ভুলে অনেক বড় বিপদে পড়তে হতে পারে। অন্যের বুদ্ধিতে কখনও কোন চালাকির আশ্রয় নিতে গিয়ে সরলপ্রাণ শিল্পোদ্যোগীদের ঠকতে হয়। সরকার বা ব্যাংক ইত্যাদির ঋণ ফেরত না দেওয়া কিন্তু খুব বিপজ্জনক কাজ। অনেকেই তা করতে গিয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেদিক থেকে একটু সাবধান হতে পারলে ভাল হয়।

ধরা যাক সব দিক বিচার করে কোন শিল্পোদ্যোগী ঠিক করলেন কি নিয়ে শুরু করবেন। শুরুর আগে তথ্য বিশ্লেষণ ঠিক হয়েছে কিনা আর একবার খতিয়ে দেখা দরকার। প্রয়োজনে কোন কোন তথ্য পরখও করতে হবে। বাজার সমীক্ষাও ঠিক হয়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন। এবার ভাবুন উৎপাদন কোথায় করবেন। নিজের বাড়ীতে জায়গা আছে? অন্য কোন জায়গার সন্ধান আছে? না হলে, সরকারি শিল্পতালুকে কি কারখানায় জায়গা নেবেন? সেখানে জায়গা নেবার নিয়ম কি? শিল্পতালুক ছাড়া অন্যত্র নিলে তাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ মিলবে কি? যেখানে শিল্প গড়বেন কাঁচামাল আনা আর তৈরী মাল বিক্রির জন্যে পাঠানোতে কোন সমস্যা আছে কি? কাছাকাছি ঠিক ঠিক কারিগর মিলবে কি? এসব খুঁটিয়ে দেখে কারখানা বা উৎপাদনের জায়গা ঠিক করতে হবে। তার ওপর বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে সরকারি বিধিনিষেধও জানা চাই।

জায়গার ব্যবস্থা ঠিক হলে ভাবতে হবে টাকার কথা। নিজের টাকা কি পরিমাণ লগ্নী করা সম্ভব, সেইমত প্রয়োজনীয় 'স্কীম' তৈরী করতে হবে। 'স্কীম' আসলে কি? 'স্কীম' হলো যে উৎপাদন হবে তার সব দিক বিচার করে রচিত পরিকল্পনা। তাতে থাকে উৎপাদনের কাজে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, কতটা জমি প্রয়োজন, কত কর্মী প্রয়োজন, কি কি কাঁচামাল প্রয়োজন, এইসব। এছাড়া থাকে লাভ লোকসানের হিসাব। বিশদ আলোচনা যথাসময়ে করা হবে। 'স্কীম'ই বলে দেবে কত অর্থ দরকার। বাইরের কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিতে গেলে তাদের নিয়মকানুনও জানতে হবে।

'স্কীমের' ব্যাপারে আর একটু বলি। 'স্কীম' তৈরী করা একটা বড় কাজ কোন অভিজ্ঞ সংস্থা হয়ত সেটা করে দিলেন, তবু সেটার সবদিক নিজে

□(শেষাংশ ৩৫৮ পৃষ্ঠায়)

একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি উপাধি বর্জন করেন। বৃটিশ সরকারের কাছে লেখা তাঁর পদত্যাগপত্র বৃটিশ শাসনের অত্যাচারী স্বরূপ সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তিনি কতখানি ঘৃণা করতেন এবং এই শাসন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার মনে কত গভীর ছিল তার এই ঘটনা থেকে জানা যায়। পরবর্তী কালেও তার এই মনোভাব আরও দৃঢ় হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত একটি প্রবন্ধও বৃটিশ সরকারের অত্যাচারী রূপ উদ্ঘাটনে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা অনেকেরই অজানা। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী উদার ব্যক্তি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তার কথা অনেকের কাছে অজানা। তাই তাঁকে সংস্কারবাদী মনোভাবাপন্ন বলে মনে করা হয়।

তাঁর ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী বৎসরে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

১৮৮৯ খৃঃ বৃটিশ সরকারের গীল ক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করে ডি.এস.সি.পড়বার জন্য বিলাতের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন এমন ছিল না যে তাঁর পিতা তাঁকে বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন। এই বৃত্তি না পেলে তাঁর পক্ষে বিলাতে পড়াশুনা সম্ভব হত না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই অনুগ্রহের জন্য যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে এই সরকারের সমালোচনায় মুখর হওয়ায় দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। তখন ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থ কোট ছিলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। ১৮৮৫ খ্রীঃ তিনি India before and after the Mutiny প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ডি.এস.সি.পাশ করায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। তাঁর চিন্তার পরিধি তো বিজ্ঞানের প্রসংগ।

ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার-বিরোধী আন্দোলনে গড়ে উঠছে কিন্তু বৃটিশ সরকার যে অত্যাচারী সরকার, শোষণ আর লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে এদেশে শাসন কায়েম করেছে–এরকম মনোভাব আন্দোলনের নেতারা আদৌ পোষণ করতেন না। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়–তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। বৃটিশের কাছ থেকে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু সুবিধা আদায় করাই ছিল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই অবস্থায় বিজ্ঞান গবেষণারত যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে রাজনীতির চিন্তার ক্ষেত্রে যে পরিচয় আমরা পেলাম তা বিস্ময়কর। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল যখন বেরোল তখন দেখা গেল তিনি প্রথম হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে বিচারকেরা মন্তব্য করেছেন যে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে এই লেখক তীব্র কটূক্তি করেছেন। এই কটূক্তির বিষয়বস্তু কি ছিল তা বিস্তৃতভাবে এখনও আমরা জানি না। তবে যতটুকু জানা গেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তখনকার দিনে ভারতের কোন নেতাই বৃটিশ সরকারের অত্যাচার আর লুণ্ঠন সম্পর্কে কোন তীব্র প্রতিবাদ করতেন না। আর যুবক প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতে গবেষণা করছেন বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে। বৃটিশ সরকার সম্পর্কে কটূ মন্তব্য করলে তাঁর গবেষণাকর্ম চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হতে পারে, তাঁর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে–একথা জেনেও তিনি এই কটূক্তি করেছিলেন!

ঐ সময়ে বৃটিশ সরকার ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে দখল করে। নির্মম অত্যাচার আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই অভিযান শেষ হয়। যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় ছিল এই নির্মম অভিযানের তথা হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ। যে বৃটিশ সরকার পররাজ্য গ্রাসে এত উৎসাহী ভারতবর্ষ অধিকার করে তার উদ্দেশ্য হল শোষণ আর লুণ্ঠন।

ভারত শাসনে বৃটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে সাবধাণ বাণী উচ্চারিত হয় এই পুস্তিকায়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই যুবকের এই একক প্রতিবাদে কত বিচলিত হয়েছিল তা পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে।

যখন প্রফুল্লচন্দ্র জানতে পারলেন যে তাঁর প্রবন্ধ পুরস্কৃত হননি তখন তিনি তাঁর প্রবন্ধ ফেরত চেয়ে নিলেন। নিজের খরচায় এই লেখা Essay on India নামে পুস্তিকাকারে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে বিলি করলেন। তাঁদের কাছে বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন জানালেন। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পুস্তিকা পার্লামেন্টের শাসকদল বিরোধী নেতা জন ব্রাইটের কাছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সারা ইউরোপের সংবাদ সরবরাহ সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট প্রতিষ্ঠান রয়টারের কাছেও এই পুস্তিকা পাঠানো হল। অতি শীঘ্রই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। অবিলম্বে পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হল।

জন ব্রাইট প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখলেন 'লর্ড ডাফরিন (তখনকার ভারতে বড় লাট) যেভাবে ব্রহ্ম অভিযান চালিত করেছেন আপনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও তার তীব্র নিন্দা করি। এর জন্য আমি দুঃখিত। বৃটিশ সরকার যে পাপ ও অপরাধ করে চলেছে এটা তারই পুনরাবৃত্তি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'স্কটসম্যানে'র পত্রিকা তাঁর পুস্তিকার সমালোচনা প্রসংগে মন্তব্য করল : ''পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য। ভারত প্রসংগে এখানে যে সব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।''

রয়টার এই পুস্তিকা ও পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সারা ইউরোপে প্রচার করে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই যুবকের প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনের যে স্বরূপ দৃঢ়তার সাথে অকাট্য তথ্যর ভিত্তিতে পরিবেশন করা হয়েছে তাতে বৃটিশ সরকার কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিল উপরিউক্ত ঘটনার তার প্রমাণ।

ভারতের বাইরে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই যুবকের লেখনী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগের সাথে তুলনীয়। পার্থক্য এখানে ভারতে তখন বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৮৫ সালে যখন বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃটিশ পুঁজির প্রতিনিধি লর্ড হিউম ভারতীয় উদারপন্থী নেতাদের নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্য ব্যস্ত–যখন ভারতে বৃটিশ সরকার-বিরোধী আন্দোলনে একান্তই আবেদন-নিবেদন নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন এই যুবকের প্রতিবাদ সত্যই ঐতিহাসিক–ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত বন্যা এলাকা পুনর্গঠনে আলোচনাচক্র

গত ২০ অক্টোবর ধনকৈল গ্রামে ব্লক সীড ফার্মে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়াগঞ্জ শহরাঞ্চল সংলগ্ন স্থানে বন্যার তান্ডবে রাস্তা ৫ জায়গায় বৃহৎ ভাবে ভেঙ্গে গেছে, একটি কংক্রীটের সেতু সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, একটি হিউম পাইপ কালভার্ট সম্পূর্ণ বিকল। আলোচনাচক্রে উপস্থিত হবার পথেই এই সব দৃশ্য চোখে পড়েছে। বন্যা ও পুনর্গঠনের আহ্বানে রচিত সংগীত দিয়ে গায়িকা দীপালি চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক "প্লাবন" নামের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পঞ্চায়েত ও জনসাধারণের পক্ষে সহস্রাধিক প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জেলা স্তরের আধিকারিকবৃন্দ ও ব্যাংকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় এই আলোচনাচক্র একটানা সাড়ে চার ঘন্টা ধরে চলেছিল, কিন্তু উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিরা শেষ অবধি উপস্থিত ছিলেন।

প্লাবন শীর্ষক প্রদর্শনীতে যেগুলি প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং এই সংগে পুনর্গঠনে যে তৎপরতা ও গণ উদ্যোগ ছিল তার সচিত্র বিবরণ উপস্থিত করা হয়। বিভিন্ন আলোকচিত্র শিল্পীর ফটোগ্রাফি ঐ সব বিষয়ে সন্নিবেশিত ছিল। তার পাশাপাশি স্থানীয় চিত্র শিল্পীরা তাঁদের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মহান অবদানগুলি তুলে ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে বন্যায় সরকারি ভাবে এবং বেসরকা-ছিত য় বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মহান অবদানগুলি তুলে ধরেছিলেন।' সেই সঙ্গে বন্যায় সরকারি ভাবে এবং বেসরকাতি জানালেন, বন্যা এলাকা পুনর্গঠনের কর্মসূচিতে কি দৃষ্টিভঙ্গী কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া দরকার, এ সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হবে।

সিরাজউদ্দিন আমেদ, সহকারী সভাপতি, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জলের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। পানীয় জল ব্যবহারে বিজ্ঞান সম্মত পথ বিশেষভাবে গভীর নলকূপের জল ব্যবহারের সুযোগ ও শিক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি দিতে আহ্বান জানান।

অজিতকুমার রায়, কর্মাধ্যক্ষ, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি ত্রাণ ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা বিস্তৃতভাবে লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। বন্যার বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চায়েত যেভাবে কাজ করেছেন তিনি তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রেখেছেন। ত্রাণ সামগ্রী কতটা কোথায় কীভাবে দেওয়া গেছে তিনি তার বিবরণ দেন। ত্রাণ ব্যাপারে যোগ্য প্রাপকদের বাছাই করা সঠিক হয়েছে বলে দীর্ঘদীন পর্যন্ত ত্রাণ সামগ্রী দুর্গতদের মধ্যে পৌঁছানো গেছে।

যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী–কর্মাধ্যক্ষ, পূর্তকার্য স্থায়ী সমিতি এলাকার রাস্তাঘাট বাঁধ কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং স্থানীয় ভাবে ঐগুলি মেরামতে যে গণ উদ্যোগ দেখা গিয়েছে তার বিবরণ দেন। বন্যাপরবর্তীকালে ঐ সব কাজে সরকারি সাহায্যের সাথে সাথে জনগণের সাহায্যের কথাও প্রকাশ করেন।

গণেশচন্দ্র দাস, প্রধান ৩ নং রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত–রাধিকাপুরের বর্তমান অবস্থা ও

পঞ্চায়েত পরিক্রমা

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি অতিশয় সংক্ষেপে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, বাঁধ, স্কুল, ঘর, ফসলের ক্ষতি, ছাত্রদের বইপত্র জামা কাপড়ের ক্ষতি সম্পর্কে তথ্য উপস্থিত করেন এবং ঐগুলি সংস্কারের গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন।

রমনীকান্ত রায়, সদস্য পঞ্চায়েত সমিতি–তাঁর লিখিত বক্তব্যে রাধিকাপুরের টাঙ্গন নদী কিভাবে ভরাট হয়ে আসছে এবং ঐ নদীর ৪/৫টি খাল কিভাবে সেখানকার বিপদ সৃষ্টি করছে বলেন। নদী ও খালগুলিতে উঁচু বাঁধ, স্লুইস গেটের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

তপন সরকার, কর্মাধ্যক্ষ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার–সমস্ত কালিয়াগঞ্জ থানায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির তথ্য উপস্থিত করেন। ঘরবাড়ি পুনর্গঠনে সারা ভারত কৃষক সভার স্বেচ্ছাসেবকেরা এ যাবৎ ১৬৬ গৃহ পুনর্নির্মাণ করেছেন জানান। সরকারের গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্প, এমন কি এন.আর.ই.পির শ্রম দিবস এই উদ্দেশ্যে যোগান দেবার প্রস্তাব রাখেন।

সন্তোষ সাহা চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ–কৃষি সেচ সমবায়–এলাকায় বন্যা বিধ্বস্ত জমির ফসলের ক্ষতির চিত্র দিয়ে বলেন, প্রচুর মিনিকিড দেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়টি আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখা দরকার হবে।

আনন্দগোপাল সরকার, সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েত–কৃষি বিষয়ে যে যে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেই সব বিষয়ে আলোচনা করেন। বন্যা এলাকা পুনর্গঠনে কৃষক সমিতি যে ভূমিকা নিয়েছে তিনি তার উল্লেখ করেন। আশিস চক্রবর্তী–মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক লিখিত বক্তব্যে এলাকার মৎস্যচাষে যে অগ্রগতি ঘটছিল তা কেমন ভাবে ব্যাহত হলো জানান। পুনরায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিনিকিড দিয়ে সাহায্যের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে ব্যাংকগুলিকে অগ্রসর হতে আবেদন রাখলেন।

নিরঞ্জন সরকার, বি.ডি.ও বন্যা আক্রমণ কালে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে কালিয়াগঞ্জে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে এবং শিল্পক্ষেত্রে যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে এলাকায় মোট প্রয়োজনীয় ঋণদানের প্রস্তাব রাখেন। একমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে ১৭ হাজার একর জমিতে রবি চাষ সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ দেওয়ার স্বার্থে বর্তমানে ২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখেন। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা এলাকায় ঋণ আদায়ের অবস্থা পর্যালোচনা করে এ আস্থা রাখতে পারেন বলে তিনি জানান।

অনুকূল ভৌমিক, অঞ্চলপ্রধান শহরাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতে মানুষের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট এবং স্কুল ঘরগুলি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ তার বিশদ বিবরণ দেন।

অমল সরকার, লীড ব্যাংক অফিসার পঃ দিনাজপুর জেলা বন্যা এলাকা পুণর্গঠনে ব্যাংকের ভূমিকা প্রসংগে আলোচনা করেন। কালিয়াগঞ্জে অনুমোদিত কাজকর্ম করবার ব্যাপারে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক ও গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক উপযুক্ত ভূমিকা নেবে বলে জানালেন।

সুধীর ভৌমিক, যোগদানকারী প্রতিনিধি বন্যাত্রাণে পঞ্চায়েত সমিতি যে ভূমিকা নিয়েছে তার প্রশংসা জানালেন। কৃষি ও গৃহ পুনর্গঠনে তিনি ত্রিস্তরের পঞ্চায়েতকে একযোগে কাজ করবার আহ্বান জানালেন।

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী যোগদানকারী প্রতিনিধি তাঁর লিখিত বক্তব্যে মানুষ কিভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেছে জানালেন এবং এই শক্তির পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ঐক্য গঠনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করলেন।

নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগদানকারী প্রতিনিধি, বন্যা এলাকার একজন মানুষ হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সেই প্রসঙ্গে বন্যাত্রাণে

পঞ্চায়েত সমিতি যে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকা নিয়েছে তার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন। ত্রাণকাজে বেসরকারি সংস্থার কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করেন।

দিলীপ দাস, যোগদানকারী প্রতিনিধি বিবৃত করেন বন্যা দুর্গত অপর একজন মানুষ কীভাবে অন্যের সাহায্যে হস্ত প্রসারিত করেছে। এই কাজে সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে ১৫৬টি পরিবারে গৃহ পুনর্নির্মিত হয়েছে। বিরেশ্বর লাহিড়ী, যোগদানকারী প্রতিনিধি, বন্যা বিধ্বস্ত কালিয়াগঞ্জ জনগণ কিভাবে ত্রাণের কাজে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অগ্রসর হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। সরকারি কর্মচারীরা এ ব্যাপারে যে ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

দিগীন্দ্রনাথ রায়, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, জি.জি.বি, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা কথা বলে আগামী কর্মসূচীতে সামিল হবেন বলেন জানান।

জেলার মূখ্য কৃষি আধিকারিক, আলোচনাচক্রে উপস্থিত কৃষি সমস্যাগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। চাষের ক্ষতিপূরণে রাজ্য সরকার যে সব কর্মসূচি নিয়েছে তিনি তার ব্যাখ্যা করেন।

ননীগোপাল রায়, আলোচনাচক্রের সভাপতি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল আসা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ন্যায্য দাবি কিভাবে উপেক্ষিত তিনি তাঁর কথা বলেন। তথাপি রাজ্য সরকার নিজের সম্বলের উপর ভর করে গৃহ রাস্তাঘাট ব্রীজ এবং স্কুলঘর নির্মাণে যে উদ্যোগ নিয়েছে তিনি তার মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন। কৃষি মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তিনি সেগুলি সফল করতে আহ্বান জানান। উপযুক্ত সময়ে আলোচনাসভা আহ্বান করে কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি যে এক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তিনি তার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আলোচনা সভার শেষে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শচীন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যোগদানকারী সমস্ত প্রতিনিধি বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে বন্যা পুনর্গঠন বিষয়ে রাজ্য সরকার যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করছে তাকে পরিপূর্ণভাবে সফল করতে কালিয়াগঞ্জের সর্বস্তরের জনসাধারণ আগ্রহী। পঞ্চায়েত সমিতি মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে ও গ্রামের মানুষের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঐ কাজগুলি রূপায়িত করতে হবে। আজকের আলোচনাচক্রে উপস্থিত করা দৃষ্টি ভঙ্গীগুলি হবে ঐ কাজ রূপায়ণের হাতিয়ার। বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজের সাথে সাথে এলকার কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারনের মাধ্যমে বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো উদ্যোগ নিতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারি কর্মচারীদের পাশে শুধু পঞ্চায়েত নয় বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবীরাও আশাকরি উপযুক্ত ভূমিকা নেবেন। সকলকে এই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত বন্যা এলাকা পুনর্গঠন আলোচনাচক্র এই আহ্বান জানিয়েছে।

ওড়ফুলিতে ঋণমেলা

উলুবেড়িয়া মহকুমার ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চক মেলাগ্রামে ভারতী শিক্ষা নিকেতন ১৪ অক্টোবর এক ঋণ মেলায় ৯৬ জন ঋণী ব্যক্তি স্টেট ব্যাংকের দেউলটি শাখার ম্যানেজারের হাতে ২৫ হাজার টাকা ফেরৎ দেন ডি.আর.ডি.এ, এফ.ডি.এ.ও 'ডি.আর.আই. প্রকল্পে ৫০০ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। যে সকল ঋণী ব্যক্তি ঠিক সময়ে তাঁদের ঋণের টাকা ফেরত দেননি তারা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত থেকে ঋণের টাকা জমা দেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য এই টাকার ৫০% অনুদান হিসাবে রাজ্য সরকার থেকে এবং বাকি ৫০% টাকা ব্যাংকের থেকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল তফসিলীদের ক্ষেত্রে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৩৩% টাকা রাজ্য সরকার বাকি ৬৭% টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। ২০ মাসের মধ্যে ঋণ শোধ করার কথা ছিল। এই ঋণের মাধ্যমে যেসব কাজগুলি হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেডিমেট পোশাকের ব্যবসা, ফুলের বাগান, পানের বরোজ, ধানের চাষ, গুড় শিল্প এবং পোলট্রি প্রভৃতি। ব্যবসার ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ২ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল।

এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং ঋণদাতারা যেভাবে তাঁদের ঋণের টাকা শোধ করতে এগিয়ে এসেছেন তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে বলে দেউলটি ষ্টেট ব্যাংক শাখার ম্যানেজার শ্রী বি কে সরকার মত পোষণ করেন। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে আরও বেশি মানুষকে নিয়ে আসা যায় তার চেষ্টা করবেন বলে তিনি জানান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগনান ২নং ব্লক-এর যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী এম দাস, গ্রাম সেবক শ্রী সুধাংশু মুখার্জি, গ্রাম প্রধান শ্রী রণজিত বেরা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্বরূপনগর ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প, আর.এল.ই. জি.পি., বৃহৎ 'এন.আর.ই.পি. এবং ডি.আর.ডি.এ. প্রকল্প স্বরূপনগর সমষ্টি উন্নয়ন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চলছে। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় এক লক্ষ গাছের চারা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার চারাগাছ এই সমষ্টি উন্নয়ন এলাকার পাঁচটি রাস্তার দুধারে লাগানো হয়েছে। ৩৫ হাজার চারাগাছ বসিরহাট-১নং পঞ্চায়েত সমিতিকে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ২০ হাজার করে চারাগাছ নিজেরা তৈরি করেছেন। এবং সেগুলি বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছে।

আর.এল.ই.জি.পি. প্রকল্পে দুটি রাস্তা করা হয়েছে। প্রথম রাস্তাটি চারঘাট থেকে গোপালপুর ফেরীঘাট, দূরত্ব ১২ কি.মি। এর মধ্যে ৬ কি.মি রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। খরচ হয়েছে ৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা ও ২০০ কুইন্টাল গম। এই ৬ কি.মি রাস্তায় ঝামা ও ইটের খোয়া দিয়ে রোলার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রাস্তাটি নির্মাণ থেকে ঘোলাঘাট, দূরত্ব ৫ কি.মি। এর মধ্যে ২কি.মি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। খরচ হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা ও ৩৯৯ কুইন্টাল গম। এই কর্মকান্ডে ২২৫৯৬টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাস্তা নির্মাণে এই এলাকার প্রায় ১৩ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

বৃহৎ এন.আর.ই.পি. প্রকল্পেও বিথারী থেকে আর্সিকারী ৪ কি.মি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজে মোট খরচ হয়েছে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ২২০ কুইন্টাল গম।

আর.এল.ই.জি.পি. প্রকল্পে এই সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থায় চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে ১' লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

ডি.আর.ডি.এ. প্রকল্পে এই সমষ্টি উন্নয়ন এলাকায় ২০০টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। এই অগভীর নলকূপের সাহায্যে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি দুফসলী বা তিন ফসলী করা যাবে বলে জানা গেল। এই প্রকল্পের অধীনে আর একটি কর্মসূচিতে তেত্রিশটি কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়েছে। মোট খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০০ টাকা।

সংস্কৃতি সংবাদ

পুতুলনাচের কর্মশালা ও প্রদর্শনী

লোক সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম পুতুলনাচ-এর উন্নতি ও প্রসারের জন্য এই শিল্প ও শিল্পীদের সামনে যে সব জটিল সমস্যাগুলি রয়েছে তা অনুধাবন ও সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে নদিয়া জেলার বগুলায় হারাণচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠে রাজ্যের সাতটি জেলার পুতুল নাচের শিল্পীদের নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারি স্তরে এই ধরনের কাজ এই প্রথম। ওয়ার্কশপে ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ গত ১৯৮০ সাল থেকে সংস্কৃতির কাজে যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন নিয়মিতভাবে পরিচালিত সেই সব কাজের মধ্যে বাংলার পুতুল নাচের উন্নতি ও ক্রমপ্রসারের কর্মসূচিও স্থান পেয়েছে। কলকাতায় ইতিপূর্বে একটি পুতুল নাচের উৎসব হয়েছে। রাজ্য ও জেলাস্তরের সংস্কৃতি উৎসবেও পুতুল নাচ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত পুতুল নাচের ওয়ার্কশক ও প্রদর্শন ৩০ অক্টোবর ১৯৮৭ নদিয়া জেলার বগুলায় উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি শ্রীসুধী প্রধান। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এর আয়োজন করেছেন। এতে পশ্চিমবংগের ৬টি জেলার ৬০ জন শিল্পী অংশ নিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে বেনী পুতুল, লাঠি পুতুল, এবং সূতো বা তারের পুতুলের শিল্পীরা রয়েছেন। এই ধরনের ওয়ার্কশপ সম্ভবত এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শিল্পীদের একটি পদযাত্রা বের হয়ে বগুলা প্রদক্ষিণ করে। এবং অনুষ্ঠান প্রাংগণে উৎসব পতাকা উত্তলিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং জেলার লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি শ্রীপরিমল বাগচী সভাপতিত্ব করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা–১৯৮৭

গত ২৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্প কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলা স্তরে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুরে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হস্ত শিল্পী তাঁদের প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায়। মোট ১২ জন প্রতিযোগীর প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার শিল্প সামগ্রী উৎকর্ষের ভিত্তিতে বিচারক মন্ডলীর দ্বারা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়। পুরস্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হস্তীদন্ত শিল্প, শোলা শিল্প, কাষ্ঠ খোদাই শিল্প, সিল্ক কড়িয়াল ইত্যাদি। বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, ব্যাংক আধিকারিক এবং জেলা শিল্প কেন্দ্রে জেনারেল ম্যানেজার। কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত দ্রব্যগুলি পাঠান হবে।

জাফরপুর পঞ্চানন পাঠাগারে প্রদর্শনী

ব্যারাকপুর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জাফরপুর পঞ্চানন পাঠাগারে গত ২১ অক্টোবর থেকে পাঁচদিনব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল ''জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার

পাঁচদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রদর্শনীর সংগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা হস্ত শিল্প প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবংগ সরকারের ক্ষুদ্র ও শিল্প অধিকারের উত্তর ২৪ পরগনা হস্ত শিল্প প্রতিযোগিতা বারাসাতে জেলা শিল্পকেন্দ্রে গত ২৩ অক্টোবর, '৮৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৭ জন কারুশিল্পী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র ও শিল্প অধিকার চার জন শিল্পীকে যথাক্রমে শ্রীমতী আমিনা বেগম, দেগংগা ব্লক, শ্রীঅমর কুমার দে, ন পাড়া, বারাসাত, শ্রীনিতাই দাস, বাদুড়িয়া এবং শ্রীপ্রশান্ত দাস, বারাসাতকে প্রথম পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম পুরস্কারের মূল্য নগদ ২৫০ টাকা। এছাড়া ৪ জন শিল্পীকে ১৫০ টাকা এবং ৪ জন শিল্পীকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলী ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জেলা শাসকের প্রতিনিধি এবং একজন বিশিষ্ট শিল্পী। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৪ জন শিল্পীকে ১০০ টাকা করে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। পুরস্কৃত শিল্পীদের কারুশিল্পীগুলি রাজ্য হস্ত শিল্পে পাঠান হবে।



আলোকচিত্রটি জাফরপুর পঞ্চানন পাঠাগারের 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' পোস্টার প্রদর্শনী জনগণ আগ্রহভরে দেখছেন

মাটির কাছের শিল্পীরা

গত ৪-১০ অক্টোবর '৮৭ সাতদিন ব্যাপী বাঁকুড়া জেলার লালমাটির পাঁচমুড়ায় কলকাতার পেন্টার্স ফ্রন্ট এক শিল্প শিবির খুলে গ্রামীণ জীবনকে শিল্প চর্চার মধ্য দিয়ে মাতিয়ে তুললেন।

গ্রামীণ জনজীবনে, মাটির বুকে, মাটির মানুষের সংগে একাত্ম হয়ে লোক আঙ্গিকের সান্নিধ্যে শিল্পচর্চা করে পেন্টার্স ফ্রন্টের ১৩ জন শিল্পী সাতদিন মাতিয়ে গেলেন পাঁচমুড়াকে।

প্রথম দিনের শিবির শুরু হয় পাঁচমুড়া হাইস্কুলে। গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় বিধায়কের সক্রিয় সহযোগিতায় সূচনা অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট, এরপর শিবির চলে আসে নির্মীয়মান পটারি কারখানার সংলগ্ন একটি ঘরে।

টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ বাংলার মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রাম লোকশিল্পের কিংবদন্তির নায়ক, মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে এখানকার রীতি মূলত ভাবপ্রধান। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট ফরম' প্রাচীনতম। পাঁচমুড়ার বিখ্যাত পোড়ামাটির ঘোড়া এই লোকশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, লালমাটি, খোয়াই এর পাশাপাশি কুম্ভকার, সাধারণ গ্রাম্যজীবন ও জীবনযাত্রা শিল্পচর্চায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে বলাবাহুল্য শিল্পীদের তা করেছেও।

শিবিরের কাজ ছিল মূলত গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংগে। পাঁচমূড়ার কাছাকাছি ফুলমণি, দেউলভিড়া গ্রামে শিল্প শিবিরের শিল্পীরা ঘুরেছেন, উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং ছবিও এঁকেছেন, কেউ ধরেছেন মাটির মায়া, কেউ এঁকেছেন মানুষ, কারোর ছবিতে মূর্ত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের শিল্পবোধ, জীবনযাত্রা। স্বভাবতই এ শিবির সাড়া ফেলেছিল গ্রামের বুকে।

সাতদিনের শেষে শিবিরে আঁকা বেশ কিছু ছবি নিয়ে আয়োজন হয়েছিল প্রদর্শনীর। পাঁচমূড়া স্কুলে প্রদর্শনীর সূচনা করেছেন গ্রাম প্রধান শ্রী নারায়ণ রজক। সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় যুবকর্মী ও গ্রামবাসীরা। শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন অমর দে, কমল আইচ, গৌতম গাঙ্গুলি, শ্যামল জানা, সুধীর মুন্সী, সুব্রত বসু, সুশান্ত ভট্টাচার্য, রোমি বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা দত্ত, তাপস সরকার, মিহির দাস, ইন্দ্রনীল ঘোষ, অরিন্দম দে।



সাহিত্যরূপা পত্রিকা ও আর্ট স্কুল আয়োজিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও চিত্রপ্রদর্শনীর একাংশ।

ছবি : সুব্রত নাথের সৌজন্যে

লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও চিত্র প্রদর্শনী

গত ১১।১০।৮৭ থেকে ১৮।১০।৮৭ পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী সাহিত্যরূপা পত্রিকা ও আর্ট স্কুল আয়োজিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল বরানগর পৌরসভা ভবন সংলগ্ন স্কুল গৃহে। উদ্বোধন করেন হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সাহিত্য আন্দোলন ও বিতর্ক সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলে এই ধরনের প্রথম আয়োজিত প্রদর্শনীতে ২৫০টির বেশি লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও আর্ট স্কুলের ১০০টির মতো নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের আঁকা রঙিন ছবি প্রদর্শিত হয়।

যুব ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

৩রা নভেম্বর – মঙ্গলবার রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। কলকাতার সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রে এবং ইউনিট এলাকার জনবহুল স্থানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদান করা হয়। সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক রবীন দেব। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন রবীন দেব, মহম্মদ সেলিম, মানব মুখার্জি, কুনাল বাগচি, অমর গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জি, মৃণাল দাস, মধুমিতা দেবরায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রবীন দেব এবং মহম্মদ সেলিম। রবীন দেব তাঁর বক্তব্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য রাজীব সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এবং বন্যা কবলিত গ্রাম বাংলার পুনর্গঠনে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্যের যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান।

সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য রক্তদান কর্মসূচী পালন করা হয়। প্রাক্তন যুবনেতা আশিস দে, বিধায়ক মানব মুখার্জি এবং কুনাল বাগচি সহ-মোট ৮৪ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে 'ঐক্যের জন্য যুব দৌড়' সংগঠিত করা হয়। প্রায় ২৫ জন যুবক-যুবতী ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নাকতলা অ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দান পর্যন্ত এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় এক পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বন্যাকবলিত গ্রামবাংলা পুনর্গঠনে সাহায্যের জন্য ব্যাপক রক্তদান কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ

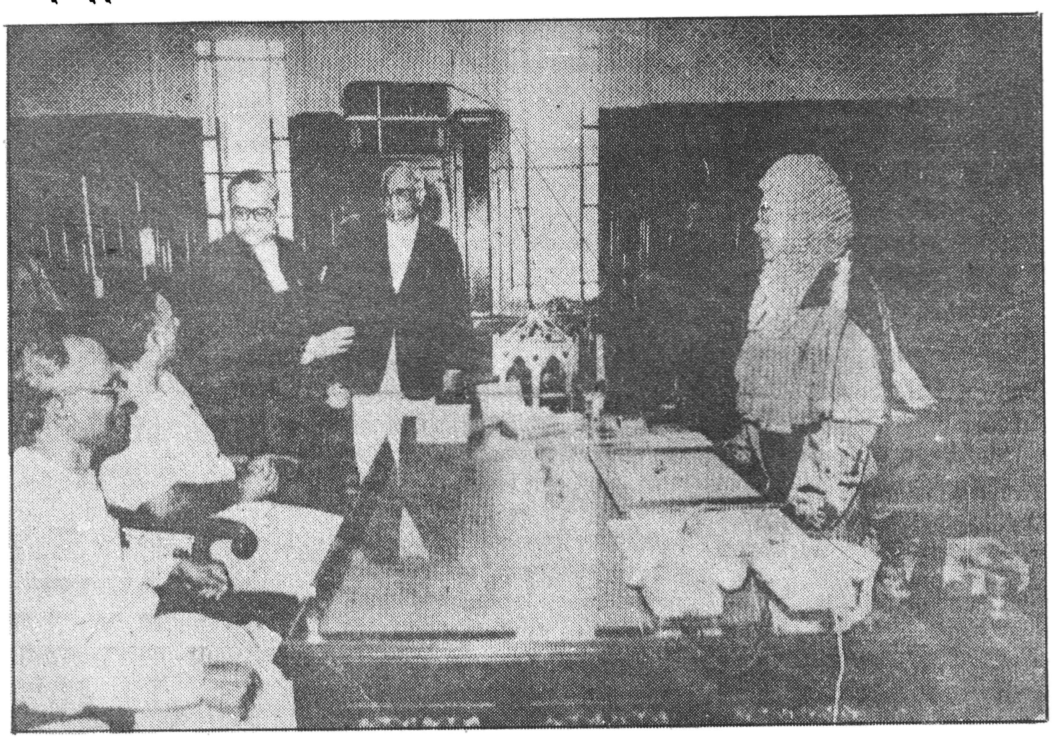
২রা নভেম্বর – বেলা ১১টায় কলকাতা হাইকোর্টের ১নং আদালতে প্রধান বিচারপতিরূপে শপথ নেন হরিয়ানা পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেবী সিং তেওয়াতিয়া। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার হাসিম আবদুল হালিম, আইনমন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল নর নারায়ণ গুপ্ত, সংসদ সদস্য সৌমনাথ চ্যাটার্জি, মুখ্য সচিব রথীন সেনগুপ্ত, সোভিয়েত কনসাল জেনারেল, আমেরিকান কনসাল, ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি এবং আইনজীবীরা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর প্রধান বিচারপতি দেবী সিং তেওয়াতিয়া বলেন সংবিধানের নামে যে শপথ নিলাম তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলব। কলকাতা হাইকোর্টের সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং সকলে যাতে ন্যায় বিচার পান সেদিকটা নজর রাখব। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত নতুন প্রধান বিচারপতিকে আইনজীবী এবং সরকারের তরফে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন আমাদের সংবিধানে আক্ষরিক আর্থে যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে প্রধান বিচারপতির আগামীদিনের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তার যথার্থতা যাতে প্রকাশ পায় তারজন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠভূমি এই পশ্চিমবাংলার জন্য আমরা গর্বিত। কারণ এখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র বাস্তবিক অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। যার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবাংলাকে নিজের রাজ্য বলে মনে করেন। আমাদের আশা নতুন প্রধান বিচারপতি সুযোগ্য নেতৃত্বে এখানকার বিচার ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলার এই সুমহান ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করবে। অ্যাডভোকেট জেনারেল ছাড়াও ঐ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রণজিত ব্যানার্জি, ইনকরপোরেটেড ল'সোসাইটির তরফে এইচ কে গাংগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের তরফে মিহির রায় বক্তব্য রাখেন।

হলদিয়ায় জনবিজ্ঞান জাঠার কর্মসূচি পালন

মাসাধিক কাল ব্যাপী ভারত জনবিজ্ঞান জাঠার পশ্চিমবংগ রাজ্য জাঠা কর্মসূচি অনুযায়ী গত ৯ অক্টোবর ১৯৮৭ এই জাঠা মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় পৌছায়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন গণ সংগঠন ও হলদিয়া আঞ্চলিক জাঠা কমিটি তাঁদেরকে স্বাগত জানান।

প্রায় পঁচাত্তর জনের বিজ্ঞান জাঠা হলদিয়ার দূর্গাচকে পৌছায় বেলা দশটা নাগাদ। জাঠা পৌছানোর আগেই শুরু হয় এক রক্তদান শিবির। স্থানীয় বিধায়ক ও হলদিয়া আঞ্চলিক জাঠা কমিটির সভাপতি লক্ষ্মণ শেঠের রক্তদানের মাধ্যমে এর শুরু হয়। এদিন এখানে ৪০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন।

জাঠার সংগে আসা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, শ্রীশংকর চক্রবর্তী, শ্রীতপন সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ। জাঠা যাত্রীদের সংবর্ধনা শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছড়া, গান, কথা দিয়ে গাঁথা অভিনয় পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন জাঠার সংগে আসা বিভিন্ন রাজ্যের বিজ্ঞান কর্মিগণ। কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূর করে বিজ্ঞানের



শপথগ্রহণের অব্যবহিত পরেই নিজকক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবীসিং তেওয়াতিয়া পরিচিত হচ্ছেন সংসদ সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত, বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম এবং রাজ্যের আইনমন্ত্রী আবদুল কাইয়ুম মোল্লার সঙ্গে।

আলোকে রঞ্জিত হওয়ার আহ্বান ছিল এর বিষয়।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্রীহীরালাল মিদ্যা, অমিতাভ সূরাল, ডঃ মনোরঞ্জন মাইতি ও অনুষ্ঠান সভাপতি বিধায়ক লক্ষ্মণ শেঠ।

এছাড়া এদিন আয়োজন করা হয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের বিষয় সম্বলিত একটি বৃহৎ পোস্টার প্রদর্শনী। স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী গাড়ি। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহাদির বিস্তারিত তথ্য জানা যায় এর মাধ্যমে। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় সংগীত, আবৃত্তি। প্রদর্শিত হয় অগ্ন্যুৎপাত ও বন্যপ্রাণী বিষয়ে দুটি চলচ্চিত্র।

উল্লেখ্য জাঠা আগমন উপলক্ষে হলদিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রাক জাঠা কর্মসূচি পালিত হয়। এলাকার ১২টি স্থানে স্লাইড, সিনেমা, যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, আলোচনা খেলনা প্রদর্শন, মডেল, বক্তৃতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছিল কর্মসূচির অন্তর্গত।

গণবিজ্ঞান জাঠা

বর্ধমান জেলা গণবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তগর্ত মেমারীতে মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উপলক্ষ্য ছিল ভূপাল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'গণবিজ্ঞান জাঠা'কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা। বিজ্ঞান প্রদর্শনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদগণের জীবনপঞ্জী, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ছবি ও মডেল, গণিতের কতকগুলি দুরূহ তত্ত্ব, আণবিক বিজ্ঞান ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তারকে ছবি ও আলোচনার মাধ্যমে দর্শকদের কাছে তুলে ধরা, নক্ষত্র যুদ্ধের পুরো পরিকল্পনা প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে দর্শকদের সতর্ক করা। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা—এইগুলি ছিল এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আকর্ষণীয় বিষয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কম্পিউটারের বিভিন্ন কলা কৌশল প্রদর্শন। ঐ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং স্থানীয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ খুব দক্ষতার সাথে দর্শকদের বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে দেন। পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ জনস্বাস্থ্য ও কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সুফল ও কুফল সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্ধমান জেলা শাখার পক্ষ থেকে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্বখাদ্য দিবস পালন

গত ১৬.১০.৮৭ তারিখে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কান্দী শাখা যশোহরি জানোখা-১ নং অঞ্চল অফিসে বিশ্বখাদ্য দিবস পালন করে। প্রায় ৭০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উক্ত সভায় যোগদান করেন। পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য ও সরকারি আধিকারিকগণের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকার কৃষি ঋণ কিভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে দ্রুত দেওয়া যায় এবং কৃষকরা যাহাতে শষ্য উৎপাদনের নতুন কৌশল গ্রহণ করে তাদের মোট উৎপাদন বাড়াতে পারে ও দারিদ্র্য দূর করতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এই এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে উপযুক্ত ভাবে ব্যাংক ঋণ দিয়ে পুনর্বাসন ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দেশপ্রাণ শাসমলের আবক্ষমূর্তি স্থাপন

গত ২৭ অক্টোবর ১৯৮৭ অপরাহ্নে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের ১০৭ তম জন্মদিনে তাঁর পুণ্য নামাঙ্কিত জাফুলি দেশপ্রাণ হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সুধীজনের উদ্যোগে তাঁর এক আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা মহোদয়ের জরুরী কার্যবশতঃ অনুপস্থিতির ফলে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি পূর্ব পাঁশকুড়ার বিধায়ক শ্রীযুত শিবরাম বসু এম.এল.এ. মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলন

গত ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বরে গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের দঃ ২৪ পরগনা জেলা শাখার ১ম বার্ষিক অধিবেশন কুল্পীতে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার, ডঃ পঞ্চানন দুয়ারী, ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা, অধ্যক্ষ সুখেন্দু সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র মোহন মজুমদার, শঙ্খদাস ভারতী প্রমুখ। দুই দিনে প্রায় দুই শতাধিক কবি, সাহিত্যিক স্বরচিত গল্প, কবিতা, ছড়া পাঠ করেন।

ব্রতচারী ক্রীড়া শিবির

সম্প্রতি হুগলী জেলা ব্রতচারী শুভকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় রবিবার চন্দননগর উষাঙ্গিনি বালিকা বিদ্যালয়ে সারাদিনের ব্রতচারী ক্রীড়া শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরের সূচনা করেন চন্দননগরের ডেপুটি মেয়র রমেশ তেওয়ারি। প্রধান অতিথি ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দিলীপ মুখোপাধ্যায়। হুগলীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী শিবিরে অংশ নিয়েছিল।



পুস্তক পরিচয়

একসাথেঃ শারদ সংখ্যা; ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা ১৬, সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায়। দাম আট টাকা।

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আদর্শে অন্বিত থেকে একটি সার্থক পত্রিকা প্রকাশ করে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিরল দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হবে। 'একসাথে' পত্রিকা এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। মূলত রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশের বলিষ্ঠ মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও 'একসাথে' কোনোদিনই সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে অবহেলা করেনি, তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রকাশ করে এসেছেন। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আ[illegible]। বর্তমান সংখ্যায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও তিনটি রেখাচিত্র শুধু পুরুষের রচনা, আর সবই মেয়েদের লেখা। সূচিপত্রের পরের পৃষ্ঠার একটি রেখাচিত্র কি যামিনী রায়ের? কালীঘাটের পটচিত্র নয় তো?

শারদ সংখ্যার সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিভাগটি হল অনুবাদ সাহিত্য। জেনি মার্কসের চিঠি, অখ্যাত মেয়ের চিঠি, একটি প্রবন্ধ, তিনটি গল্প ও দুটি কবিতা অনবদ্য। প্রাণের আবেগ ও হৃদয়ের আর্তি ফুটে উঠেছে প্রতিটি রচনায়। সুপ্রিয়া আচার্য, মীরা ভঞ্জ, শিউলি মজুমদার, শিপ্রা রাহা, বেলা ভট্টাচার্য, নিবেদিতা নাগ ও অপর্ণা পালচৌধুরী সুন্দর অনুবাদ করেছেন।

সীতা মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা বড় আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা। সেদিনের গণনাট্যের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিচিত্র স্বাদের ১২টি প্রবন্ধ এই সংকলনের সম্পদ। নারীভাবনা থেকে শুরু করে সুকুমার রায়, যামিনী রায়, মে দিবস, নজরুল, ভারতীয় অর্থনীতি, শান্তি সম্মেলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বলিষ্ঠ ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ লিখেছেন মঞ্জুশ্রী দাস সামন্ত, অনুশীলা দাশগুপ্ত, সুশীলা গোপালন, লিলি দত্ত, অপির্তা মুখোপাধ্যায়, রূপা নাগ, শ্যামলী গুপ্ত প্রমুখ। প্রবন্ধগুলো পাঠককে ভাবায়। তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা সার্থক। ইলা ভট্টাচার্যের চীন ভ্রমণের রচনাটিতে চীনকে নতুনভাবে চেনা যায়।

এই সংকলনের কবিতা ও গল্পাংশ বেশ দুর্বল। অবশ্য অধুনা বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল অংশদুটি গল্প ও কবিতার মান আগের তুলনায় যথেষ্ট নিচে নেমে গিয়েছে। তবু কনক মুখোপাধ্যায় ও রূপশ্রী দত্তের গল্প বেশ উদ্দীপনায়ময়। প্রণতি ঘোষ, রানু চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি দাশের গল্পে প্রাণের স্পর্শ রয়েছে।

নারী আন্দোলনের সার্থক হাতিয়ার হিসেবে বর্তমান সংখ্যাটি জনপ্রিয় হবে বলে আশা করি।

—দিব্যজ্যোতি মজুমদার

• (৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

তরিতরকারির ক্ষেতের ব্যাপারেও সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন।

গ্রামের কাছাকাছি পাখিরালয়ে পাখীদের কূজন শোনা যাচ্ছে, ব্যাঘ্র পরিবারের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, লুপ্ত প্রায় প্রজাতিগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে, প্রজনন সংক্রান্ত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়েছে।

সংখ্যালঘু ধনিক গোষ্ঠী মানুষের বেঁচে থাকার সমৃদ্ধি লাভের সমস্ত উপকরণ, সমস্ত সম্পদকে কব্জা করে রাখায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নিঃস্ব মানুষ প্রাণ ধারণের তাগিদে অরণ্য সম্পদকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়। সংখ্যালঘু ধনিক শ্রেণীর বিবেকশূণ্য লালসার যৌথ ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় অরণ্যজীবন বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে তাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম উপায় সংরক্ষিত এলাকার প্রান্তশায়ী অঞ্চলে কর্ম-সংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক সমস্যাগুলির সমাধান করা। একমাত্র এভাবেই সংরক্ষিত অরণ্যাঞ্চলকে ধরে রাখা যাবে, রক্ষা করা যাবে।

আমরা এ ব্যাপারে 'আকস্মিক পরিবর্তন' ঘটাতে চাইছি এবং বনভূমিকে কর্ষণ করে ঝুরো মাটিতে পরিণত করে (ড্রাই ফার্মিং) চাষ করার প্রস্তাব রেখেছি। এর জন্য ৫২ সপ্তাহই কাজ করে যেতে হবে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য উদ্বৃত্ত সম্পদ ধরে রাখতে হবে এবং এটা এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা পশু শিকার ও ফাঁদ পেতে কোনো বন্য প্রাণী ধরাও বন্ধ করেছি। সেই সঙ্গে প্রাণী সম্পদ নিয়ে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফালাভের বিপজ্জনক এই অসাধু ব্যবসা যা সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তা সমূলে বিনষ্ট করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে ঐসব অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ পশু শিকারের স্থল নয়।

আমরা চিত্রিত হরিণ (স্পটেড ডিয়ার) ও সাদা বুকওয়ালা কিং ফিসার (মাছরাঙা) পাখীকে যথাক্রমে রাজ্য পশু ও রাজ্য পাখীরূপে চিহ্নিত করেছি। ছাতিম গাছ ও শিউলি (শেফালী) ফুল যথাক্রমে রাজ্য গাছ ও ফুল গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের বার্তা অতি সুস্পষ্ট।

আমাদের যা নেই তা পেতে হবে। অযোধ্যা পাহাড়ের সন্নিকটে একটি সিংহ উদ্যান (Lion Safari) আমরা গড়ে তুলব এবং এ বছরের মধ্যেই সেটি করা হবে।

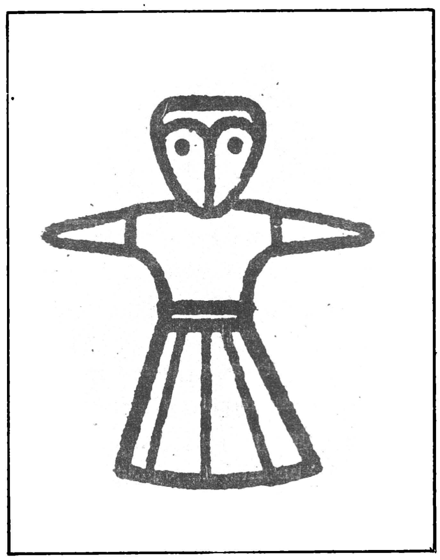
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কলকাতায় একটি উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা তৈরীর পক্ষে এবং এ ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজকর্ম চলছে।

আমরা এইসব সুযোগ ছেড়ে দিতে পারি না কারণ এর সাথে জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। জাতীয় স্তরে পরিকল্পনায় চরম বিভ্রান্তি থাকার ফলে এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে যার ঝোঁক রয়েছে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে পরিপোষণ করার জন্য দেশীয় ও বিদেশীয় একচ্ছত্রতার দিকে; যখন ধনতন্ত্রই বিপর্যয়ের মুখে। এই নীতির দ্বারা শাসকগণ আমাদের ভাগ্যকে এমনভাবে বিপর্যয়ের সাথে জড়িয়ে দিচ্ছেন যে বিবেকের দংশন ভোগ করার সুযোগও আমাদের থাকছে না।

আমরা যদি চরম বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকি তবে তা আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে এবং তা নিজের হাতে নিজের সমাধি প্রস্তুত করা বা মৃত্যুর ঘণ্টা বাজানোর সমান হবে।

'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' অতএব বনেই তাদের বৃদ্ধি ঘটতে দিন। আমাদের কাছে প্রকৃতি তার সমগ্র সম্পদ নিয়ে ধরা দিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের এই সম্পদ রক্ষা করতে হবে এবং সময় থাকতে আসুন আমরা সকলে এই কর্তব্যের সম্মুখীন হই।

বাঁচুন ও বাঁচতে দিন।



পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনেমাস (রেগুলেশন অফ পাবলিক এক্সিকিউশান) রুলস, ১৯৫৬ সংশোধন করে এই বিধিতে সর্বসাধারণের কাছে ভিডিও টেপে গৃহীত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ২রা এপ্রিল, ১৯৮৭ তারিখে এই সংশোধিত বিধি কলকাতা গেজেটে ক্সট্রা অর্ডিনারি) প্রকাশিত হয়েছে।

এখন থেকে জনসাধারণকে ভিডিও চলচ্চিত্র দেখাতে হলে প্রদর্শনকারীকে তার জন্য লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। জেলায় এই লাইসেন্স দেবেন জেলাশাসক এবং কলকাতায় পুলিস কমিশনার।

চায়ের দোকান, হোটেল, বার, রেস্টুরেন্ট, বাস, ইত্যাদি স্থানে ভিডিও চলচ্চিত্র দেখাতে হলে আয়োজককে উপরে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল(রেগুলেশন অফ স্পেশাল এক্সিবিশান) অর্ডার ১৯৮৭ অনুসারে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে সেন্সর করা হয়নি কিংবা বিধিবহির্ভূতভাবে তৈরি করা হয়েছে এমন ভিডিও ফিল্মস ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাখা, প্রদর্শন করা অথবা মজুত করা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রীন পার্ক কলিকাতা

কৃষিশুমারী- '৮৫-৮৬

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-১৯৮৬ সালের কৃষিশুমারির কাজ শুরু হয়েছে। আগের মতই ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগে কর্মরত ভূমি সহায়কেরা এ কাজের জন্য প্রাথমিক গণনাকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। ভূমি সহায়কেরা নির্বাচিত জোতের কৃষকদের সঙ্গে দেখান রাশুমারীর জন্য চাষ জোত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

কৃষক-বন্ধুদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন ভূমি সহায়কদের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করেন এবং চাষ জোত সংক্রান্ত তথ্যাদি দিয়ে কৃষিশুমারির কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত করেন।

প্রসঙ্গত কৃষি শুমারীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখা হয় এবং কেবলমাত্র সমষ্টিগত তথ্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় পরিকল্পনায় কৃষিশুমারীর তথ্যের অসীম মূল্যের কথা বিবেচনা করে কৃষক বন্ধুরা যেন কোন কিছু গোপন না করে সঠিক তথ্য দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার